রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা
রমরমা

রমরমা

তারাপদ রায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ইং ১৫ এপ্রিল ১৯৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
দেবাশীষ দেব
কলকাতা
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদমুদ্রন
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
তাপসকুমার দোলুই
সোমা প্রিণ্টার্স
হাওড়া।

উৎসর্গ

শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

লেখকের অন্য বই :

- বানরেরা মানুষ হচ্ছে
- জ্ঞানগম্যি
- টিউব শিশুর বাবা
- কাণ্ডজ্ঞান
- টমটমপুরের গল্প
- বিদ্যাবুদ্ধি
- শোধবোধ

মুখবন্ধ

এই বইয়ের নাম রমরমা ? এরকম নামে পাঠক পাঠিকাদের ভীত হবার কোনো কারণ নেই, আমার অন্যান্য হালকা রচনার মতোই এটি একটি নিরামিষ গ্রন্থ। এই বইতে রম্যরচনা, রম্য কাহিনী এবং রম্য নিবন্ধ এই তিনরকম একত্রিত হয়েছে। প্রসঙ্গত নিবেদন, এর মধ্যে একটি রচনা আছে, 'ঘাতকের মৃত্যু', সেটাকে রম্য বলা যাবে না। কিন্তু এটি আমার প্রথম গল্প, সেই সুবাদে এই বইতে রেখে দিলাম নিতান্ত ব্যক্তিগত দুর্বলতায়।

তারাপদ রায়

সূচীপত্র

জাহাজ

জাহাজ শব্দটি অবশ্যই বাংলা নয়। বাংলা ভাষায় আরো বহু আরবি শব্দের মতোই শব্দটি ভারতীয় ভাষায় এসেছে মুসলমান যুগের আদি-পর্বে। মূল আরবি শব্দটি হলো জাহাজ।

জাহাজকে সংস্কৃতে কিংবা সাধু বাংলায় বলা যায় অর্ণবপোত অর্থাৎ সমুদ্রযান। জাহাজ নৌকোর বা স্টিমারের মতোই জলযান কিন্তু বৃহৎ জলযান।

তবে এতো ব্যাখ্যার তেমন প্রয়োজন নেই। সবাই জানেন জাহাজ জিনিসটা কি। আমরা ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গে দেখেছি লোকজন স্টিমার-কেও জাহাজ বলতো। স্টিমার স্টেশনকে বলতো জাহাজঘাটা। সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করতো, 'জাহাজ কখন আসবে ?'

এখন জাহাজের জায়গা দখল করেছে উড়োজাহাজ। দেশে দেশান্তরে এখন ভ্রমণকারীরা আর জাহাজে ভেসে যায় না, উড়োজাহাজে উড়ে যায়।

দেশের ভেতরে অভ্যন্তরীণ যাতায়াতেও জাহাজ বা স্টিমারের ব্যবহার নেই। এই ডিজেল ট্রেন, ইলেকট্রিক ট্রেন, হাইওয়ের যুগে জলপথ প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। স্টিমার একটি বিরল দর্শনবস্তু।

অবশ্য স্কুলপাঠ্য ভূগোল বইতে এখনও পৃথিবী যে গোলাকার সেটা প্রমাণ করতে প্রথমেই জাহাজের উদাহরণ দেওয়া হয়। মহাসমুদ্রে দূর-দিগন্ত সীমায় যখন একটি জাহাজ দৃষ্টিপথে আসে, তখন বিন্দুবৎ জাহাজ-টির সম্পূর্ণ চেহারা একসঙ্গে চোখে পড়ে না। প্রথমে চোখে পড়ে তার সামনের অংশ, গলুই, ডেক ইত্যাদি। তারপরে ওপরের কেবিন, তার-

পরে একে একে মাস্তুল ও চোঙা। চোঙার বহু ওপরের ধোঁয়া অবশ্য প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয়।

পৃথিবী গোলাকার হওয়ার জন্যেই এ রকম হয়, গোলাকার না হয়ে সমতল হলে পুরো জাহাজটা একসঙ্গে নজরে আসতো।

জাহাজের যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। মালবাহী জাহাজ এখনও আছে, কিন্তু যাত্রীবাহী জাহাজ নেই বললেই চলে। ষাটের দশকের গোড়াতে ভারতীয় বন্দর থেকে শেষ বিলেতগামী যাত্রিবাহী জাহাজ ছেড়েছে। অবশ্য সৈন্যবাহী জাহাজ এখনও আছে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর (সেভেনথ্ ফ্লিট) রীতিমতো ভীতিপ্রদ।

জাহাজ ভ্রমণ নিয়ে সব ভাষাতেই অজস্র কাহিনী আছে। তার অনেক-গুলিই সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় পর্যন্ত অনেকেরই আশ্চর্য লেখা আছে জাহাজ ভ্রমণ নিয়ে।

জাহাজি যুগের অন্তিমপর্বে এসে দুয়েকটি চমকপ্রদ কাহিনী শেষবারের মতো স্মরণ করা যেতে পারে।

পঞ্চাশ বছর আগে কালীগোপালবাবু জাহাজে করে বোম্বাই থেকে বিলেত গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। জাহাজে ওঠার পর প্রথম রাতেই ডাইনিং টেবিলে তাঁর মুখোমুখি বসলেন এক ফরাসী ভদ্রলোক। ফরাসী কেতায় ভদ্রতা জানিয়ে ফরাসী ভদ্রলোক বললেন, 'Bon Appetit', কালীগোপাল ভাবলেন, ভদ্রলোক তাঁর নাম বলছেন, তিনিও তাঁর নাম জানালেন, 'কালীগোপাল।'

এই রকম বেশ কয়েকদিন চললো। ফরাসী সাহেব বলেন, 'Bon Appetit', কালীগোপাল বলেন, 'কালীগোপাল।'

কালীগোপালের অবশেষে একটু খটকা লাগলো। প্রতিদিনই নিজের নাম বলার কি আছে। খুঁজে পেতে জাহাজের মধ্যেই এক ফরাসী জানা ভারতীয় ভদ্রলোককে ধরলেন কালীগোপাল। তাঁকে ঘটনাটা

সবিস্তারে বলতে তিনি খুব হাসলেন। তিনি কালীগোপালকে বললেন, 'Bon Appetit' ওই ভদ্রলোকের নাম নয়, এটা হলো এক ধরনের ফরাসী শুভেচ্ছা, যার মান হলো, 'আপনার ভোজন মধুর হোক।' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেই দিনই রাতে খাওয়ার টেবিলে ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতে কালীগোপালই প্রথম শুভেচ্ছা জানালেন, 'Bon Appetit' এবং কি আশ্চর্য সেই ফরাসী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'কালীগোপাল।' বলা বাহুল্য, সাহেব ধরে নিয়েছিলেন, 'কালীগোপাল' শব্দটিও সুভোজনের শুভেচ্ছা।

জাহাজের পর জাহাজডুবির গল্প। সেকালে পৃথিবীতে জাহাজডুবির সহস্র কাহিনী। কতো যে জাহাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলদস্যুদের অত্যাচারে মাঝদরিয়ায় ডুবে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এই রকম এক জাহাজডুবির পর এক নাবিক জাহাজডুবির পর কোনো রকমে সমুদ্রে ভেসে থেকে তারপর এক নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় পায়। সেখানেই ফলমূল, কাঁচামাছ ইত্যাদি খেয়ে তার কয়েক বছর কাটে। অবশেষে এক সমুদ্রগামী জাহাজ তাকে ওই নির্জন দ্বীপে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে।

কিন্তু জাহাজটি সেই দ্বীপের তীরে এসে নাবিকটিকে প্রথমেই উদ্ধার করে না। জাহাজের ডেক থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব একগাদা পুরানো খবরের কাগজ নাবিকটির দিকে ছুঁড়ে দেন, দিয়ে বলেন, 'এই কাগজগুলি আগে পড়ে সভ্য পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা বুঝে নাও। তার পরেও যদি তোমার সেখানে ফিরতে ইচ্ছে হয়, তা হলে জাহাজে উঠে এসো।' সেই নাবিকটি এর পর কি করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না।

শরৎচন্দ্র

সন ১৯৩৬। শরৎচন্দ্র শান্তিপুরে গিয়েছেন। উপলক্ষ সাহিত্য সম্মেলন। শরৎচন্দ্রই সেই সম্মেলনের সভাপতি।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ অধ্যায় সেটা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে। কল্লোল যুগের লেখকেরা আসরে নেমেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তখন আসমুদ্র-হিমাচল অখণ্ড বঙ্গভূমির হৃদয়ের রাজা, নয়নের মণি। তাঁর সেদিনকার সেই জনপ্রিয়তা, আজ এতোদিনের পরে তার পরিমাপ করা কঠিন। চারদিকে শুধু প্রশংসা আর স্তুতি, যেখানেই যান সেখানেই শুধু প্রশস্তি আর প্রশস্তি।

সেদিন শান্তিপুরেও তাই হচ্ছে। একটি ছেলে একনাগাড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে বসে তাঁর প্রশংসা করে চলেছে। অনেক চাটুকারের পরিমিতি-বোধ থাকে না। দশজন লোকের মধ্যে একজনকে এমন প্রশংসা করে চলে, এমন স্তাবকতা করে যে রীতিমতো অস্বস্তির কারণ হয়।

সেদিনও তাই হলো। সম্মেলন আরম্ভ হতে তখনও বেশ কিছুক্ষণ বাকি আছে। যেখানে অতিথি হয়ে উঠেছেন তারই ঘরে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে শরৎচন্দ্র আপন মনে তামাক খেয়ে যাচ্ছিলেন, ছেলেটি প্রশংসা করে যাচ্ছিল।

ছেলেটি বললো, 'অনেক বিদেশী উপন্যাস পড়েছি কিন্তু আপনার লেখায় যে বেদনা আছে তা কোথাও নেই।'

ছেলেটি আরও বললো, 'বিদেশী লেখকের লেখা পড়ে চোখের পাতা ভেজে না। কিন্তু আপনার লেখা পড়ে কতো যে কেঁদেছি।'

এতক্ষণে শরৎচন্দ্র মুখ খুললেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'না না, এতো কাঁদা

ঠিক নয়, চোখ খারাপ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে হাসির গল্পও পড়বে।'

সেদিন নাকি শরৎচন্দ্র পরে মন্তব্য করেছিলেন, 'নিজের প্রশংসা শুনতে শুনতে তামাক পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠলো।'

সে যা হোক, চমৎকার সদুপদেশ দিয়েছিলেন সুরসিক শরৎচন্দ্র। অশ্রু-নদীর এই কাণ্ডারী বলেছিলেন, 'না, শুধু কান্না নয়, হাসিও চাই।'

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ভট্টাচার্য প্রণীত 'রসিক শরৎচন্দ্র' বইটিতে এই কাহিনীটি পেলাম। আমার ধারাবাহিক রচনামালায় আমি বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্রের রসিকতা সম্পর্কে লিখেছি। শরৎচন্দ্রের রসবোধ ছিল অসামান্য। এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আছে। সেই সিরিজে 'রসিক শরৎচন্দ্র' শেষ সংযোজন। গ্রন্থকার শ্রীভট্টাচার্য লণ্ডনের শরৎ আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং বহুকাল ধরে 'সাগরপারে' নামক একটি পত্রিকা বিলেত থেকে প্রকাশ করে আসছেন।

রসিক শরৎচন্দ্রের অন্তর্গত গল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই সুপরিচিত। কোনো কোনোটি ইতিপূর্বে গোপাল রায়ের বইয়ে পড়েছি। এবং আমিও লিখেছি। আপাতদৃষ্টিতে দুয়েকটি কাহিনী কিঞ্চিৎ অচেনা মনে হচ্ছে।

বসন্ত চট্টোপাধ্যায় তখনকার একজন নামকরা কবি। অতিথিবৎসল ভদ্রলোক, দাবার ভক্ত। শরৎচন্দ্র নিজেও দাবার ভক্ত। বসন্তবাবুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনে গিয়ে দাবা খেলতে বসেছেন।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যাচ্ছে। দাবা খেলা চলছে। এক দান খেলার শুরুতেই বসন্তবাবুর চালে শরৎচন্দ্রের একটা নৌকো মারা পড়লো। শরৎবাবু যেন মহাখুশি, বললেন, 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। ওটা আমার ফুটো নৌকো।'

কিছুক্ষণ বাদে আবার বসন্তবাবুর মুখে বিজয়ীর হাসি। শরৎচন্দ্রকে বললেন, 'ঘোড়া সামলাও।' শরৎচন্দ্র ঘোড়া সামলাতে পারলেন না, ঘোড়া মারা পড়লো, কিন্তু শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'জানো বসন্ত, আপদ গেল। ওটা বেতো ঘোড়া। কোনো কাজের নয়, অন্ন ধ্বংসের গুরুমশাই।'

বেলা গড়িয়ে যায়। বসন্তবাবুর বাড়িতে শরৎচন্দ্র অতিথি। বসন্তবাবু বললেন, 'এবার ওঠা যাক। খাবেন না?'

শরৎবাবু জবাব দিলেন, 'জানো তো? খেলেই আমার আনন্দ।'

কথাসাহিত্যিকের কথার প্যাঁচ বুঝতে অসুবিধে হলো বসন্তবাবুর। তিনি সরাসরি বললেন, জানি, আপনার খেলেই আনন্দ। এখন পরিষ্কার করে বলুন, খেলা করতে চান না খেতে চান?'

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'দুটোই।'

অতঃপর আরেকটি গল্প এবং এটিই শেষ গল্প। বলা বাহুল্য, এই কাহিনী-টিও হিরণ্ময়বাবুর 'রসিক শরৎচন্দ্র' বইতে রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবন, কলকাতায় বালিগঞ্জের নবনির্মিত বাড়িতে উঠে এসেছেন। সেখানে রাতদিন জমজমাট আড্ডা। নতুন পুরনো বন্ধু-বান্ধব, পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশক, অতিথি-অভ্যাগত। সারাদিন হই হই, হট্ট-গোল।

কয়েকদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। তখন শরৎচন্দ্রের বই-য়ের প্রকাশক স্বনামধন্য হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শরৎচন্দ্রকে একটি নীতিকথা শোনালেন। নীতিকথাটি হলো এই যে, এই রকম এক মজ-লিসি বাড়ির কর্তা তাঁর বাড়িতে আড্ডা-মজলিসে কেউ বেশিক্ষণ জুড়ে বসে থাকলে চাকরকে ডেকে সিন্দুক খুলে তাঁর বাড়ির দলিলটা বার করিয়ে আনতেন, তারপর সেটা দেখিয়ে সেই আড্ডাধারী বা আড্ডা-ধারীদের বলতেন, 'এই দেখুন। এ বাড়ির মালিক আপনি নন, আমি। এবার উঠুন।'

হিরণ্ময়বাবু অবশ্য লেখেননি শরৎচন্দ্র তাঁর প্রকাশকের ইঙ্গিত অনুসরণ করে কোনো অতিথিকে বাড়ির দলিল দেখিয়েছিলেন কি না। বোধহয়, দেখাননি।

খেলাচ্ছলে

পাঁচটা পেনাল্টি কিকের আয়োজন করছি। অবশ্য এ খেলায় কোনো বিরোধী দল নেই, কিকদাতা এবং গোলরক্ষক আমি নিজেই। খুব নরম করে কিক করবো এবং আমি নিজেই দৌড়ে গিয়ে গোল হওয়ার আগে বলটা ধরবো। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো গোল হয়ে যায় তার জন্যে দায়ী হবে আমার স্থূল দেহ এবং জড়তা।

আমার প্রথম পেনাল্টি কিকটির জন্যে আমাকে খুব দৌড়োদৌড়ি করতে হয়নি। কারণ এটি আমার নিজেকে নিয়ে। কেন আমি রসিকতা করি —এই নিয়ে আমার এই মর্মান্তিক শট।

আগে গল্পটা বলে নিই। উত্তর কলকাতার এক ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডারটি ছিলেন সুরাদাস অর্থাৎ টানা মাতাল। সকাল নটা থেকেই কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক মদ্যপান শুরু করতেন। তবে ডাক্তারবাবুকে লুকিয়ে। ফার্মেসির ভিতরের ঘরে ওষুধপত্রের শিশি বোতলের মধ্যে তিনি দু-চার বোতল দিশি মদ লুকিয়ে রাখতেন, ফুরিয়ে গেলে আবার নতুন বোতল নিয়ে এসে ডাক্তারবাবু আসার আগেই ফার্মেসির মধ্যে আড়ালে রেখে দিতেন।

কাজ করতে করতে, ওষুধ-মিকশ্চার বানানোর ফাঁকে ফাঁকে দু-চার ঢোক গিলে নিতেন কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোক। তবে ডাক্তারবাবুকে সমীহ করতেন, ডাক্তারবাবু যেই ডাকতেন কোনো প্রেসক্রিপশন দেয়ার জন্যে বা ইঞ্জেকশনের জন্যে, পকেট থেকে দুটো লবঙ্গ বের করে মুখে দিয়ে নিতেন, ডাক্তারবাবু যাতে কাছাকাছি গেলে মদের গন্ধটা না পান। গত পঁচিশ বছর ধরে এইরকম করে চালিয়ে আসছেন কম্পাউণ্ডারবাবু। কিন্তু আজ-

কাল লবঙ্গের দর যা বেড়েছে তিনি আর কুলোতে পারছেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি এখন পকেটে করে কাঁচা পেঁজায় নিয়ে আসছেন। ডাক্তারবাবু ডাকলেই এক কামড় পেঁয়াজ চিবিয়ে যাচ্ছেন মদের গন্ধ আড়াল করার জন্যে।

প্রথমদিন ডাক্তারবাবু একটু ভুরু কোঁচকালেন। তাতে কম্পাউণ্ডারবাবু ভাবলেন, মুখে পেঁয়াজের গন্ধ পেয়েছে, সে যা হোক মদের গন্ধ তো টের পাচ্ছে না কিন্তু দ্বিতীয় দিন ডাক্তারবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। তুপুরবেলা রোগী রোগিণী সব চলে যাওয়ার পরে ফার্মেসি বন্ধ করার মুখে ডাক্তারবাবু কম্পাউণ্ডারকে ডাকলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, দেখুন কম্পাউণ্ডারবাবু, আজ পঁচিশ বছর ধরে অনেক সহ্য করেছি, ভরতুপুরে দিশি মদ আর লবঙ্গের গন্ধ আপনার মুখ থেকে ভক ভক করে বেরিয়েছে। বহু কষ্টে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তুদিন হলো আপনার মুখ থেকে কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে মদের গন্ধে নাড়ি উল্টে যাচ্ছে। বুড়ো বয়েসে আর নতুন কিছু সহ্য হবে না। মাসে গোটা কুড়ি টাকা এক্সট্রা নিন, লবঙ্গের যা দাম হোক লবঙ্গই খাবেন।'

বলা বাহুল্য ঐ একই কারণে আমি বোকা হাসি আর খেলো রসিকতা না করে পারি না। যদি লবঙ্গের বদলে পেঁয়াজ ধরি পাঠকেরাই চটে যাবেন। তবে কর্তৃপক্ষ হয়তো তু পয়সা বেশি দিতে পারেন লবঙ্গের জন্যে, কিন্তু সেটা খুব সম্মানজনক নয়।

বুদ্ধিমতী খেলাপাঠিকা, অয়ি ফুটবলরসিকা, জানি আপনি ঠোঁট টিপে হাসছেন, বুঝতে পারছেন আমার প্রথম শটটি আমি ইচ্ছে করেই গোলপোস্টের উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি, ফলে এই মোটা শরীর নিয়ে গোল বাঁচানোর পরিশ্রম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি।

আমার দ্বিতীয় শটটি সংক্ষিপ্ত।

এ গল্পটি এক আধুনিক বাঙালী যশস্বী লেখককে নিয়ে। গল্পটি ত্রিকোণ প্রেমের। ত্রিকোণ প্রেমে কি থাকে? তুই পুরুষ আর এক মহিলা, যেমন

বঙ্কিমচন্দ্র। কিংবা দুই মহিলা আর এক পুরুষ, যেমন শরৎচন্দ্র। কিংবা মার্কিনী গে উপন্যাসে তিন পুরুষ; বড়জোর ফরাসী নীল কথিকায় তিন রমণী। কিন্তু আমাদের এই বাঙালী লেখকটি তেমন নন, তিনি স্ত্রৈণ। তাঁর ত্রিকোণ প্রেম হলো একজন লেখক, তাঁর স্ত্রী এবং সর্বশেষ নিজেকে নিয়ে।

এই স্ত্রীর সূত্রেই আমি দ্রুত তৃতীয় শটে চলে যেতে চাই। কারণ সবাই বুঝতে পেরেছেন আমার পূর্বের শটটি গোলপোস্টে লেগে ফিরে এসেছে। তবে, ভয়ে ভয়ে লিখছি, এবার এই তৃতীয়তে যা লিখছি সেটা আমার বক্তব্য নয়, আমার এক প্রিয় বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মহিলা হলেন আমার স্ত্রী। আর এটা যে শুধু আমার নিজেরই কথা তা নয়, আমার স্ত্রীও ঐ একই কথা বলেন।'

এখনও কোনো গোল হয়নি। হবেও না। আর মাত্র দুটো কিক বাকি আছে। চেষ্টা তো করতে হবে।

কিছুই মাথায় আসছে না। যাই, রাস্তা থেকে এক পাক ঘুরে আসি। ঘুরে এলাম। মোড়ের মাথায় একটা ভিখিরির সঙ্গে দেখা হলো। নতুন ভিখিরি, আগে কখনও এ পাড়ায় দেখিনি। ভিখিরিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় রাখা আমার বহুদিনের অভ্যেস। এর সঙ্গেও আলাপ করতে গেলাম।

লোকটি দেখলাম চালাক। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাকে একটা টাকা দেবো না দশটা পয়সা দেবো?' সে বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'দিন একটা দশ পয়সা।' আমি বললাম, 'এক টাকা নয় কেন?' সে ম্লান হেসে বললো, এক টাকা তো আপনি দেবেন না। দশ পয়সা দিলেও দিতে পারেন।'

লোকটি বুদ্ধিমান, আমার চার নম্বর কিকটি সেই-ই করে দিলো।

সুতরাং এবার পঞ্চম বা অন্তিম শট, বোধ হয় বলা উচিত পারটিং কিক। এটি একটি বিলিতি গল্প। এক সাহেবখোকা তার বয়েস ছয়-সাত হবে,

সে তার বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে। বাবা দেয়ালে একটা ছবি টাঙাচ্ছিলেন। শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে সে বাবার মিস্তিরিগিরি পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ সে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে ছুটে গেল।

মেম মা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, কি হলো! কান্নার কি হয়েছে ?'

খোকা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিলো, 'দেয়ালে পেরেক গাঁথতে গিয়ে বাবার বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলে হাতুড়ি লেগে গেছে।'

মা হেসে বললেন, 'বোকা ছেলে, এইজন্যে কাঁদছো। বাবার কিছুই হয়-নি। এটা দেখে তোমার হাসা উচিত ছিল।'

খোকা চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'আমি তো হেসেই ছিলাম, আর তখনই বাবা আমাকে চড় মারলো।'

শেষ প্রশ্ন ঃ

কখনও অন্ধকার রাতে আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে আপনার কি মনে হয়েছে যে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে ভগবান পৃথিবীর ফটোগ্রাফ তুলছেন ?

দীর্ঘজীবন

সাহিত্যের ক্লাসে সেক্সপীয়র পড়াচ্ছেন অধ্যাপক। পড়াতে পড়াতে খুব ভাবাকুল হয়ে পড়েছেন, 'আজ যদি মহাকবি জীবিত থাকতেন তিনি আমাদের অবশ্যদ্রষ্টব্য হতেন।' অধ্যাপক বাক্য শেষ করা মাত্র একটি চ্যাংড়া ছেলে উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যাঁ, স্যার, তাঁর চারশো বৎসর বয়েস হতো।' সেক্সপীয়র কিংবা যে কোনো লোকই যদি চারশো বৎসর কিংবা তার অর্ধেক অন্ততঃ দুশো বৎসরও বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর আর কোনো কষ্টই প্রয়োজন নেই, তিনি এমনই তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্যে সপ্তমাশ্চর্যের প্রথম বলে পরিগণিত হতেন।

কখনো ইরান থেকে, কখনো রাশিয়া থেকে কিংবা কখনো এই বাংলাদেশেরই কোনো অঞ্চল থেকে পৃথিবীর সেই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী লোকটির নাম কাগজে বেরোয়। কখনো তাঁর বয়েস দেড়শো বছর, কখনো একশো বত্রিশ বছর কিংবা ঐ রকম। তাঁর সম্বন্ধে নানা খবর বেরোয় কাগজে। তিনি দৈনিক সাড়ে চার মাইল রাস্তা হাঁটেন। তাঁর প্রপৌত্রীয় বয়েস উননব্বই, তাঁর বংশধরদের সংখ্যা তিনশো সাতাশ তিনি বাহাদুর শাহকে দেখেছেন, তিনি সিপাহি যুদ্ধ দেখেছেন, তখন বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এক ধরনের পাখি দেখা যেতো নাম ছিল ক্যাঁচাও।

কি করে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়? এর কি কোনো ফর্মুলা বা সূত্র আছে। ইংরেজী উপদেশ বলছে, ছটায় ঘুম থেকে উঠে দশটায় মধ্যাহ্নভোজন; তারপরে ছটায় নৈশভোজন, দশটায় ঘুম, এই হলে শতায়ু হওয়া যায়। কিন্তু আমি জানি যে, অন্ততঃ সন্ধ্যা ছটায় নৈশভোজন সমাপ্ত হলে রাত দশটায় ঘুমই আসবে না। খিদের চোটেই ঘুম আসবে না। এই রুটিন

মেনে চললে শতায়ু হয়তো দূরের কথা আমি ছয় মাসও বাঁচবো কিনা সন্দেহ।

একজন বললেন, নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবী হয়, অমনি তিনজন অমর কসাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেল—যাদের জীবিতাবস্থায় শতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এবং যারা সমস্ত জীবন দৈনিক প্রায় একটা করে পাঁঠা খেয়েছে। দুটি প্রবাদ আছে, কথা বেশী বললে আয়ু কমে যায়, আর হাসলে আয়ু বাড়ে। এরকম উল্টো ব্যাপার ভাবাই যায় না, কথা বলবো না কেবলই হাসবো, পাগল নাকি। সুকুমার রায় আবিষ্কার করেছিলেন, দেশে গেলে সবাই পটপট করে মারা যায়; শ্রীনিবাস দেশে গিয়েছিল সুতরাং সে আর ফিরবে না। আমাদের যাদের দেশ নেই, কিম্বা দেশ দেশে মোর ঘর আছে, তাদের অবশ্য এ সমস্যা নেই।

আসলে অধিকাংশ লোক যেরকম প্রায় বিনা কারণে সরে যায়, সেই-রকম কিছু কিছু লোক বিনা কারণে বহুদিন বেঁচে থাকে। দৈনিক সোয়া সের করে তামাকের ধোঁয়া পান করে, জীবনে একদিনও তামাক না টেনে, সারাজীবন ধরে পরিশ্রম করে, সারাজীবন ধরে বিশ্রাম করে, সব কিছু করে, কিছুই না করে, ওষুধ খেয়ে, ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ না খেয়ে, ডাক্তার না দেখিয়ে কতো বিচিত্র বিপরীত কারণে দীর্ঘজীবী হয় লোকে।

এ বিষয়ে একজন দীর্ঘজীবী লোকের বিবৃতি একবার পত্রিকায় বেরিয়ে-ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন মশায়রা, আমি যে এতকাল বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ বোধহয় ঐ ব্যাকটেরিয়া-ফ্যাকটেরিয়া ইত্যাদি আবিষ্কারের ঢের আগে আমি জন্মেছিলাম।'

আজকাল প্রায় সব রোগেরই কোনো না কোনো প্রতিকার বেরিয়েছে, শুধু ক্যান্সার আর করোনারি ছাড়া। শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় যেন লিখেছিলেন, অধিকাংশ মানুষই মারা যায় হয় পরনারীর জন্যে, না হয় করোনারির জন্যে।

করোনারি-পরনারি-থাক, ক্যান্সারের বিষয়ে কিছু বলি।

সিগারেট খেলে কি ক্যান্সার হয় ? এ বিষয়ে সমস্ত স্তরে, সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞ থেকে রাস্তার লোক পর্যন্ত সমান তর্কপ্রবণ হয়ে ওঠে। ইয়োরোপে ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞের এক অধিবেশন হয়েছিল কিছুকাল আগে। সেই অধিবেশনে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছিলেন, তুমুল হৈচৈ হয়েছিল সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয় কিনা, তাই নিয়ে। উত্তপ্ত অধিবেশনের শেষে সভাপতির ভাষণ, তিনিও ভুবনবিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি বললেন, 'সমবেত চিকিৎসকবৃন্দ, আমরা সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের এই তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতাবলী একত্র করে একটি মাত্র বাক্যে এই অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছি। এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে সিগারেট খেলে গলায় ক্যান্সার হয়, সিগারেট না খেলে পেটে ক্যান্সার হয়।'

কোনো এক অফিসে

রাজেনবাবু আজ মাসখানেক অফিসে যাচ্ছেন না। তাঁর ধারণা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুদ্ধের খবর কি?'

কোন্ যুদ্ধ কিসের খবর কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু ভেবেচিন্তে আমি বললুম, 'চীনেরা তো চুপচাপ বসে রয়েছে, ওদের মতিগতি বোঝা কঠিন।'

'আর কদিন চপচাপ থাকবে না থাকতে পারবে, জাপানীরা ওদের সব খেদিয়ে মঙ্গোলিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দেবে।' রাজেনবাবু বিশেষ বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

'কিন্তু জাপান এর মধ্যে কি করবে!' আমার গলার স্বরে সংশয় বোধহয় স্পষ্ট হলো। রাজেনবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে একসঙ্গে বহু কথা বলে গেলেন। যার সারার্থ এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। খবরের কাগজওয়ালা এই আঠারো-উনিশ বছর ধরে সংবাদ চেপে যাচ্ছে। তবে আর কতদিন চেপে থাকতে পারবে, মিত্র-শক্তির পতন অনিবার্য।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। আগেও যেন কোথাও শুনেছি না পড়েছি আরেক পাগলের কথা যার নাকি ধারণা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এখনো চলছে। সে যাহোক রাজেনবাবুর ডালহৌসি স্কোয়ারে তাঁর অফিসে যাওয়ার মূল অসুবিধে ওটা নাকি মিত্রপক্ষের এলাকা। পাড়ার মধ্যে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাঁরা ডালহৌসি অঞ্চলের কর্মচারী তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তাঁর ধারণা তাঁরা গুপ্তচর। গভীর অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, হুঁ-হাঁ করে দু'একটি কথা বলেন।

এই অবস্থায় রাজেনবাবুর স্ত্রী আমাকে একদিন বললেন, 'উনি তো আজ একমাসের ওপর অফিস যাচ্ছেন না। আপনি ওঁর অফিসে গিয়ে একটু দেখেন এই দুর্দিনে চাকরিটা না যায়। কি যে করি।

একদিন দুপুরে সময় করে রাজেনবাবুর অফিসে পৌছলাম। গিয়ে তাঁর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'এই ইয়ে। রাজেনবাবুর ব্যাপারে একটা কথা জানতে এসেছি।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেল বাজিয়ে পিয়ন ডাকলেন, ডেকে কি একটা ইঙ্গিত করে বললেন, 'রাজেনবাবু?' আমি কিছু জানাবার আগেই পিয়ন বেরিয়ে গেল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ড্রয়ার থেকে একটা পেন-নাইফ বের করে হাতের নখ কাটতে লাগলেন। আমি বাধ্য হয়ে চুপ করে রইলাম। একটু পরে পিয়ন ফিরে এসে ইঙ্গিতে কি জানালো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টবাবু আমাকে জানালেন,

'রাজেনবাবু সিটে নেই।'

তখন আমাকে বলতে হলো, উনি সিটে নেই, আমিও জানি, আজ এক-মাস সিটে নেই। সেটাই বলতে এসেছি।'

'ও কোনো নালিশ আছে?' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেল বাজিয়ে পিয়নকে বললেন, 'এই এঁকে বরদাবাবুর কাছে নিয়ে যা।'

পিয়ন আমাকে অফিসের মধ্যে একটা টেবিলের সামনে নিয়ে গেল, তার সামনে বোর্ডে লেখা রয়েছে 'কমপ্লেইনস'। বরদাবাবু নামে ভদ্র-লোকের সঙ্গে দেখা হলো, খুব সদাশয়, হাসিহাসি মুখ। যা বললাম সব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপরে একটা হাই তুললেন, একটা ডিবে থেকে নস্যি বের করে নাকে দিয়ে আবার হাসিহাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন। সন্দেহ হলো, মাথা খারাপ নয় তো। কিন্তু চোখের চাউনি দেখে তো মনে হচ্ছে না। আধঘণ্টা কথা বলার পরে বুঝলাম লোকটি বদ্ধ কালা।

আবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ফিরলাম। ওঁকে বেল বাজানো, পিয়ন

ডাকা ইত্যাদির কোনো সুযোগ না দিয়ে রাজেনবাবুর সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললুম। সব শুনে তিনি যেন একটু আশ্বস্ত হলেন।

'তাহলে রাজেনবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, আবার অনুরোধ করলাম, 'দেখবেন ওঁর চাকরিটার ক্ষতি না হয়। আমরা ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি।'

'চাকরির ক্ষতি? এই অফিসে?' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রীতিমতো অবাক হলেন, তারপর বললেন, 'এতো সহজে এ অফিসে চাকরির ক্ষতি হয় না মশায়। বরদাবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে?'

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'ওই বরদাবাবু আরে মশায় যেদিন ইলেকট্রিক ট্রেন শুরু হয় সেইদিনই ঝুলে আসতে গিয়ে একটা পিলারে গুঁতো খেয়ে সাতদিন অজ্ঞান। তিনমাস পরে কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু কানে একদম শুনতে পান না। বসিয়ে দিলুম কমপ্লেইন ব্রাঞ্চে, যার যা নালিশ যত ইচ্ছা জানাও, কিছু শুনতে পায় না। গালাগাল করো, মৃদু মৃদু হাসবে। বড় অমায়িক স্বভাব ভদ্রলোকের তার উপরে কানে কালা।···অতো সহজে কি চাকরি যায়? ভবানীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। ডাহা তোতলা। ফোনের টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি। একটি প্রশ্নেরও জবাব পাবে না কেউ। অফিসে ফোন আসা বন্ধ হয়ে গেছে।'

একটু থেমে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রশ্ন করলেন, 'বরদাবাবু মাঝেমধ্যে মারধোর করছেন তো?'

হ্যাঁ কি না বলবো কিছু বুঝতে না পেরে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, আর একবার নখ কাটলেন। তারপর বললেন, 'রিসেপশন টেবিলটা দেখলেন না আমার ঘরে ঢোকার আগে? এখানে আগে ভরদ্বাজবাবু বসতেন ওঁকে পেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকতে হতো। ছ'মাস আগে এলে 'আমার সঙ্গে আপনার দেখা

করাই হতো না। তখনো উনি রিটায়ার করেননি। ভরদ্বাজবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে বড় অসুবিধায় আছি। রিসেপসন সেক্সনের লোক নেই অফিসে। বুঝলেন, আমাদের একটি আক্রমণপরায়ণ উন্মাদ দরকার, যান তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজেনবাবুকে নিয়ে আসুন।'

এই সময় বাইরে দুমদাম শব্দ শোনা গেল। সুপারিন্টেডেন্ট বললেন, 'সেরেছে, আজ আবার পেনসনের তারিখ। ঐ ভরদ্বাজবাবু বোধহয় পেনসন নিতে এলেন।'

আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুতগামী হলাম। পিছনে রিসেপসন টেবিলের উপরে কে যেন একটা চেয়ার আছাড় দিলো বলে মনে হলো।

ঘড়ি

খুব অল্প বয়েসে আমি মেলা থেকে একটা সচিত্র গোপাল ভাঁড় কিনেছিলাম। বইটা যে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ নয়, সেটা আমি অনেক বড়ো হয়ে বুঝেছি, কিন্তু সেই বয়সেও গোপাল ভাঁড় আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল। হয়তো এর রসিকতাগুলির অধিকাংশের কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারিনি বলেই। এগুলির মধ্যে যেগুলি মোটা দাগের স্থূল বা অশ্লীল, তার মানে বড়ো হয়ে বুঝেছি, সবগুলি যে খুব হাসির তাও মনে হয় না এখন। কিন্তু এই বইয়ের মলাটে যে প্রচ্ছদচিত্রটি ছিলো তার মানে আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি, হয়তো আমি যখন আরও বড়ো হবো, অনেক বুদ্ধি হবে তখন হৃদয়ঙ্গম হবে ঐ প্রচ্ছদোপরি হাসিটির মর্ম।

মলাটের ঐ বিখ্যাত ছবিটি অনেকেই দেখেছেন, ছবিটি আর কিছুই নয়, গোপাল ভাঁড় রাস্তায় চলেছেন, তাঁর গলায় একটি ঘড়ি ঝোলানো, তাঁকে একজন পথচারী প্রশ্ন করছে, 'কটা বাজে ?' গোপাল ভাঁড় আকর্ণ-বিস্তারিত রহস্যময় হাসির ছটায় আপ্লুত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছেন, 'কটা চাই ?'

এই 'কটা বাজে' আর 'কটা চাই' দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের দৃশ্যটি যতবার মনে পড়ে ততবারই হাসি পায় কিন্তু ঠিক হাসির কারণটা কি আজও ধরে উঠতে পারিনি। আসলে এর মধ্যে রসিকতা যতটা আছে তার থেকে অনেক বেশি বোধহয় রয়েছে একটি অতিবাস্তব চিরজিজ্ঞাসা। কারণে-অকারণে, রাস্তায়-অফিসে, এমন কি জানলা দিয়ে বাড়ির মধ্যে মাথা গলিয়ে, ত্রিশ পয়সা ব্যয় করে টেলিফোন করে ক্রমাগত লোকেরা সময় জানতে চাইছে। ঘড়িহীন লোকদের ঘড়িওলা লোকদের কাছে এই সময় জানার অধিকার কবে কোন্ আইনে, কোন্ সংবিধানে ন্যস্ত হয়েছিল, ঈশ্বর জানেন, কিন্তু আপনার কাছে ঘড়ি থাকলে কেউ না কেউ আপনার কাছে কখনো না কখনো সময় জানতে চাইবেই, আপনার আপত্তি করলে চলবে না, এমন কি গোপাল ভাঁড় যা করেছিলেন, 'কটা চাই ?' প্রশ্ন করলেও প্রহৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

পরীক্ষার হলে, খেলার মাঠে, রেল স্টেশনে এই সব জায়গায় যেখানে সময়সীমা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত, সেখানেই বেশি প্রশ্ন ওঠে, 'কটা বাজে ?' এই প্রশ্ন যাঁরা করেন তাঁদের অনেকের হাতেই অবশ্য ঘড়ি রয়েছে, হয় উত্তেজিত হয়ে তাঁরা নিজেদের ঘড়ি দেখতে ভুলে যান অথবা সময়ের চাপে পড়ে নিজেদের ঘড়ির উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

ঘড়ির কথা বলতে গেলে বলা উচিত ছিল আমাদের শৈশবের অ্যালার্ম ঘড়িটির সত্য কাহিনী। আমার এক মাসীমা আত্মরক্ষার জন্যে এই ঘড়িটি একটি আরশোলাকে ছুঁড়ে মারেন ফলে ঘড়ি, আরশোলা এবং সেই সঙ্গে মাসীমা নিজে অজ্ঞান হয়ে যান। আরশোলাটি অজ্ঞান

অবস্থাতেই মারা যায় আর ঘড়ি প্রায় ছয়মাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। পরের শীতকালে অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর আমরা যখন মামার বাড়ি বেড়াতে যাই তখন অন্যান্য বছরের মতো বহুবিধ দ্রব্যাদির সঙ্গে এই বন্ধ ঘড়িটি আমরা সংগ্রহ করে আনি এবং ফিরে এসে আমাদের ছোট শহরের একমাত্র ঘড়িসারাই-এর দোকানে টাইমপিসটি সারাতে দিই। মাস চারেক আমরা তিন ভাই ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে দৌড়া-দৌড়ি করে ঘড়িটি উদ্ধার করলুম। কিন্তু ঘড়িটি যদিও চালু হলো, ঠিক-মতো চালু হলো না। প্রথম প্রথম অল্প অল্প ফাস্ট হতো, তারপরে ঘন্টায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট করে ফাস্ট হতে লাগলো। তাতেও আমাদের অসু-বিধা ছিলো না, আমরা প্রতিদিন চাবি দেওয়ার সময় ঘড়ি মিলিয়ে দিতাম, এবং ঘড়ির পাশেই একটা চার্ট করে রেখেছিলাম যে চার্ট দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যেতো, ঘড়িতে এখন দেড়টা বাজে অর্থাৎ প্রকৃত সময় পৌনে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। এই চার্টটি করতে আমাদের তিন ভাইয়ের দুই সপ্তাহ সময় লেগেছিল। আমাদের আঙ্কিক প্রতিভা দেখে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্য সঞ্চার হয়েছিল।

কিন্তু ঘড়ি ফাস্ট যাওয়ার ব্যাপার নয় সবচেয়ে গোলমাল হলো অ্যালার্ম যন্ত্রটি নিয়ে। ঘড়ির চাবি আর অ্যালার্মের চাবি কি করে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন সেই মফস্বলী কারিগর। দম দেওয়ার ঠিক বারো ঘন্টা পরে ঘড়িটা বেজে উঠতো। বাজনার তালে তালে টেবিলের উপরে নেচে নেচে লাফাতো ঘড়িটা, কখনও কখনও নিচে পড়েও যেতো। দুবার কাঁচ ভেঙে যায়, একবার দাদার পায়ে পড়ে পা কেটে যায় কিন্তু ঘড়িটা কিছুতেই বন্ধ হতো না। কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হওয়ার পর আমরা টেবিলের নিচে একটা বালিশ পেতে রাখতাম, ঘড়িটা নাচতে নাচতে সেই বালিশের উপর পড়ে যেতো এবং তখনও বাজতো, তারপরেও নাচতো।

ভিখারী

আমরা যে বাসায় থাকি সেটা একেবারে সদর রাস্তার ওপর বসানো। একটা গুরুতর বাঁকে এমন কোণাকোণিভাবে বাড়িটা রয়েছে যে সতত সঞ্চরমাণ ভিখারিকুলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এই সামান্য স্থানটি এবং যেহেতু আমি একতলায় এবং বাড়ির সামনের অংশে থাকি এই বিপুল সাহায্যপ্রার্থী জনতাকে আমাকেই ক্রমাগত ঠেকাতে হয়।

আমার যাঁরা পরিচিত অনেকেই জানতে চান আমি কিভাবে ঠেকাই? ঠেকাতে পারি কি না? পারলেই বা কি রকম না পারলেই বা কি রকম? উত্তরে আমি জানাই এর আবার রকমসকম কি? প্রতিটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কায়দা ব্যবহার করি।

যেমন ধরা যাক আমাদের প্রতিবেশী সাবানের কারখানায় প্রাচীন কালের পেটা ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে ওঠার অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হন এক বন্যাপ্রপীড়িত পরিবার। স্বামী স্ত্রী দুই পুত্র তিন কন্যা মাদুর লণ্ঠন এমনকি একটি লেজকাটা কুকুরসুদ্ধ।

এই পরিবারটিকে স্বাগত জানাবার জন্যই জেগে থাকি। অনাথার এঁরাই আমার কাঁচা ঘুম চটিয়ে সমস্বরে এবং কাংস্য কণ্ঠে বাসি রুটির আবেদন জানাতে থাকবেন।

এঁদের সঙ্গে আমার একটা রফা হয়েছে। এঁরা আমার বাড়িতে এসে পৌঁছালেই আমি দরজা খুলে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আধঘন্টা সময় মানে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম হিন্দী সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি, পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা কুকুরটি ছাড়া এই পরিবারের প্রত্যেকে এই আলোচনার পরম উৎসাহ ও উত্তেজনা সহকারে যোগদান

করে। আলোচনা অন্তে ভিক্ষা নেওয়ার কথা মোটেই মনে থাকে না। এমনিতেই প্রসন্ন চিত্তে চলে যায়। মধ্য থেকে আমার সাপ্তাহিক এক টাকা সত্তর পয়সা ব্যয় বেড়েছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একটি হিন্দী ছবি দেখতে হচ্ছে।

সে যা হোক এখন অন্যান্য ভিক্ষুকদের কথা বলি। যাঁরা ভিখারি ভাবলেই মনে করেন শৃঙ্খলাহীন ভবঘুরে সমাজের কথা তাঁরা একবার এসে অন্তত সাতদিনের জন্যে থেকে যেতে পারতেন আমার বাসায়। প্রতিটি ভিখারিই একটি নির্দিষ্ট ছকে শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন করে। যে গড়িয়াহাট মোড়ের ডানদিকে দাঁড়ায় তাকে গুলি করে মেরে ফেললেও বাঁদিকের মোড়ে দাঁড় করানো যাবে না। তেমনি বাজারের ভিখারি বা স্টেশনের ভিখারি কোনো দিনে মোড়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু পাড়ার ভিক্ষুক একেবারে অন্য জাতের। যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে পাড়ার মধ্যে ঘোরে সে আবার কিছুতেই বাজারে স্টেশনে বা মোড়ে যাবে না। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের মতো একটি নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে সে দোলায়িত। একটা নিয়ম সে অনবরত মেনে চলেছে। হয় একই বাড়িতে সে সপ্তাহে একবারের বেশি আসবে না, না হলে দিনে একবারের বেশি আসবে না। আর খুব বেশি হলে প্রতি বেলায় একবারের বেশি আসবে না। অর্থাৎ সকাল দুপুর বিকেল এবং রাত এই চার বেলায় চারবার। যে সাপ্তাহিক আসে সে সপ্তাহান্তেই আসবে, যে দৈনিক আসে সেও ঠিকই আসবে আর যে প্রতি বেলায় আসে সেও চারবার ভিক্ষা চাইতে আসবে প্রতিদিনই।

উষালগ্ন থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত ভিখারির ধুম পড়ে যায় আমার দরজার সামনে। অনেক সময় একাধিক ভিখারির মধ্যে মারামারি বেধে যায়। সে মারামারি থামাতে হয় আমাকেই। যাকে কিছু দিই সে দু মিনিট চেঁচায় যাকে দিই না সে দশ মিনিট চেঁচায়।

এইভাবে চলছিলো গত সাত বছর।

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে পরশুদিন থেকে। আমার ছেলেটির গরমের ছুটি হয়েছে। তাকে একটা বাঁধানো খাতা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি সদর দরজার পাশের জানলায়। যে ভিখারিই আসে তাঁকে সে প্রশ্ন করে তাঁর নামধাম বয়েস ঠিকানা, কতদিন ভিক্ষা করছে আর কতদিন করবে, দৈনিক কতো আয় হয়, বংশে আর কেউ ভিক্ষুক আছে কিনা ইত্যাদি বহুবিধ সকল বিষয়ে। উত্তরের বিনিময়ে প্রতি ভিক্ষুক পাবে একটি করে দশ পয়সা। বলা উচিত এই দুদিনে একটি দশ পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি। খাতা-কলম প্রশ্নের বহর দেখে ভিখারিরা এখন পণ্ডিতিয়া থেকে পলাতক।

শীলাকে ভালোবাসি

আমি শীলাকে ভালবাসি। আই লাভ শীলা—জীবনের প্রেমের পাঠ আমার সেই প্রথম। তখন আমার বয়েস কতো হবে বারো, বড়জোর তেরো। মফঃস্বলের হাই ইংলিশ স্কুলের ক্লাস এইটে পড়ি।

কোনো শিক্ষক কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে যজ্ঞডুমুর এই বলে সম্বোধন করতেন। যজ্ঞেশ্বর আমার এবং ক্লাসের অধিকাংশের চেয়ে অন্ততঃ সাত বছরের বড় ছিলো। সবচেয়ে আগে, বেয়ারারা ঘর ঝাঁট দেবারও অনেক আগে সে স্কুলে এসে পৌঁছতো। আসতো সেও বেশ দূর থেকে,প্রায় তিনটে গ্রাম পাড়ি দিয়ে। কামাই একেবারেই হতো না। ক্লাস পালাতো না। স্কুলে যাওয়ার পথে বাজারের রাস্তায় অথবা কালীবাড়ির সামনে জটলায় আমাদের তাগাদা দিয়ে যেতো, 'যা যা, বাড়ি গিয়ে স্নান করগে, বেল্ পড়ে যাবে।'

আমরা সেই বয়সেই ঘড়ি দেখা বিশ্বাস করতে শিখেছিলুম। তাই এরও

অনেক পরে স্নান-খাওয়া করে বেল্ বাজবার আগেই স্কুলে পৌঁছে যেতাম।

টিফিনের সময়েও ক্লাস থেকে বেরোত না যজ্ঞেশ্বর। সবচেয়ে আগে এসে ফার্স্ট বেঞ্চে ফার্স্টে বসে থাকতো সব সময়, কিছু কিছু পড়াশুনাও করতো। সেই যজ্ঞেশ্বর পরপর দশদিন অনুপস্থিত। আমি ভাবলুম শরীর খারাপ হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর আমাদের সঙ্গে প্রায় অভিভাবকসুলভ ব্যবধান রাখত। কিন্তু, এরই মধ্যে ওর সঙ্গে আমার অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিলো কি জানি কেন, সে যেন আমাকে একটু স্নেহই করতো।

এগারো দিনের মাথায় যজ্ঞেশ্বর এলো। তাও তার যথাসময়ে নয়। বেল পড়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই এলো। উস্কো খুস্কো চুল, চোখ লাল, ময়লা জামা-কাপড়। নীল ফুলসার্ট গায়ে দিতে, কোনে সময়া হাতা আট-কানো ছাড়া দেখিনি, আজ এলোমেলোভাবে গোটানো।

কি হয়েছিল, অসুখ নাকি ? কিন্তু হাবভাবে সেরকম কিছুই মনে হয় না। বরং কোনো বিপর্যয়, বাড়িতে কারো অসুখ বা মারা গেছে। প্রথম পিরিয়ডের পর যজ্ঞেশ্বরের কাছে গিয়ে বললাম, 'কি হয়েছে, এ কদিন এলে না কেন ?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো যজ্ঞেশ্বর, তারপরে একটু থেমে বললো, ছুটির পরে থাকিস।'

ছুটির পরে কম্পাউণ্ডের বাইরে গেটের পাশে এসে দাঁড়ালাম, যজ্ঞেশ্বর পিছিয়ে পড়েছিলো, এগিয়ে এসে বললো, 'বাসায় যা, বাসার থেকে ডেকে নেবো। বাসায় থাকিস।'

আধঘন্টা পরে যজ্ঞেশ্বর আমাদের বাসায় এলো, যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ, একটু থমথমে তারপর নদীর ওপারে স্পষ্ট বনরাজিনীলার দিকে তাকিয়ে বললো 'তুই বুঝতে পারবি না, আর তোকে বলা উচিত হবে না।' দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে যোগ করলো, এ বয়সে তুই 'এসব বুঝতেও পারবি না।'

বেশি আগ্রহ দেখানো অনুচিত হবে ভেবে, আমি কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কাটলো। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যজ্ঞেশ্বর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আই লাভ্ শীলা,' বলে হনহন করে হাঁটতে লাগলো, আমি যথাসম্ভব তাল রক্ষা করে তার পশ্চাদনুসরণ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর, যজ্ঞেশ্বর উঁচু একটা বালিঢিপির ওপরে বসলো, আমিও গিয়ে বসলাম।

'আমি শীলাকে ভালোবাসি,' এবার স্পষ্ট বাংলায় বললো যজ্ঞেশ্বর, যেন বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল তার, একটু স্বস্তি পেলো যেন এইভাবে বলতে পেরে। আমি আর কি বলতে পারি—চুপচাপ রইলাম।

'একটা চিঠি দিতে হবে শীলাকে, তুই লিখে দে,' যজ্ঞেশ্বরের এই অনুরোধে একটু ঘাবড়ে গেলাম। আর তাছাড়া কে শীলা, কি ব্যাপার কিছুই জানি না। যজ্ঞেশ্বর আবার বললো, 'শীলাকে মুখেই বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, এডুকেটেড মেয়ে, একটা চিঠি লিখেই জানতে হবে।'

পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেন্সিলের খণ্ড বের করে বললো, 'লেখ।'

কিন্তু কি লিখবো, যজ্ঞেশ্বরই উদ্ধার করলো, ডিক্টেশন দেয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'মাই ডিয়ার শীলা।' তখন আমাদের ক্লাসে বাবার কাছে ইংরেজি চিঠি লেখা শেখানো হচ্ছে। আমি বললাম, 'বাবাকে তো লেখে মাই ডিয়ার ফাদার।'

যজ্ঞেশ্বর চিন্তিত হলো কি করা যায় তাহলে? আমি পরামর্শ দিলাম 'ডার্লিং সুশীলা' বলে সম্বোধন করতে, আমার কি করে ধারণা হয়েছিলো যে প্রিয়তমাই ডার্লিং। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাধা দিলো, 'আরে না, ডার্লিং হলো বাচ্চা মেয়ে। দেখিস না, পুলিস সাহেব তার ছোট মেয়েকে ডার্লিং বলে ডাকে?'

কি জানি! এমন সমস্যায় আর কখনো পড়িনি। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর মরীয়া। 'মুখে বলতে পারলাম না, চিঠিও লিখতে পারবো না, আমি এখন কি করি!' যজ্ঞেশ্বর উঠে দাঁড়ালো,'তাহলে আমাকে আত্মহত্যাই করতে হবে'। তার আগে আরেকবার বলি, 'আই লাভ শীলা।' যজ্ঞেশ্বর অবশ্য আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু এতদিনে যেন বুঝতে পারি, ভাবপ্রকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে কেন যজ্ঞেশ্বর আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলো। এ ঘটনার পর যজ্ঞেশ্বর আর ঘরে আসেনি। প্রেমে পড়ে অথবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিলো। আমার অবশ্য মনে দুর্ভাবনা ছিলো, যজ্ঞেশ্বর বুঝি সত্যিসত্যিই আত্মহত্যা করে বসেছে। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গেও দেখা নেই, যজ্ঞেশ্বর যে গ্রামে থাকতো সে তল্লাটের বিশেষ কাউকে চিনতামও না।

মাস তিনেক পরে একবার মাছ ধরতে গেছি যজ্ঞেশ্বরদের গ্রামের দিকের এক খালে, সেখানেই তার সঙ্গে আমার দেখা হলো, 'কিরে, কেমন আছিস?' আমার প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হেসে যজ্ঞেশ্বর জানালো, ভালো। 'ইস্কুলে যাস না কেন?' যজ্ঞেশ্বর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, বললো, 'দোকান দিয়েছি।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'মাছ মেরে ফেরার পথে বাজারটা ঘুরে যাস। দেখা হবে, সেখানেই আমার দোকান রয়েছে।'

ফেরার পথে বাজারে গিয়ে দেখলাম, এক প্রান্তে ছোট একটা মনিহারি দোকান। দোকান ছোট, কিন্তু দোকানের পক্ষে বিরাট এক সাইনবোর্ড। 'শীলা ভাণ্ডার, প্রোঃ যজ্ঞেশ্বর দাস।'

সেদিন অনেক কথা হলো কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকে কিছুতেই শীলা-সংক্রান্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করা আমার হলো না। কি একটা সংকোচে পড়ে বাধা পড়লো আমার। কৌতূহলে একটু পরে উঠে এলাম। কিন্তু শীলা বিষয়ে ঠিক কতদূর কি গড়িয়েছিলো, তা আজ পর্যন্ত আমার জানা হয়নি।

এর পর প্রায় বছর সাত-আষ্টেক আমি ও যজ্ঞেশ্বর পরস্পর সম্পর্কশূন্য। আমি কলকাতায় পড়তে চলে এসেছি, যজ্ঞেশ্বর ওখানেই রয়ে গেছে। দু'একবার ছুটিছাটায় বাড়ি গিয়েছি, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের গ্রাম অবধি

আর পৌঁছনো হয়নি।

তবু হঠাৎই আবার দেখা হয়ে গেল। আর যজ্ঞেশ্বরের গ্রামেরব াজারে নয়, এবার আমাদের শহরেরই বাজারে ; বাজার করতে গেছি, ঢোকার মুখেই বাধা পেলাম। যজ্ঞেশ্বর পাশের একটা দোকান থেকে ডাকছে। 'গ্রামে ব্যবসা-পত্র চলে না, দোকান এখানেই উঠিয়ে নিয়ে এলাম,' যজ্ঞেশ্বর হেসে আমাকে বসতে বললো। বাজার থেকে ফেরার পথে আর একটু বসে গেলাম। বহুদিন পরে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে গল্প আর তেমন জমলো না। একটু দুঃখ হলো।

পরের দিন আবার বাজারে যেতে দেখলাম, যজ্ঞেশ্বরের দোকানে একটা নতুন সাইনবোর্ড তোলা হয়েছে। লাল রঙের অক্ষরে কালো জমির ওপরে মফঃস্বলী ধাঁচের লেখা সাইনবোর্ড, 'মনোরমা ভ্যারাইটি স্টোরস্।' কেমন কৌতূহল হলো, যজ্ঞেশ্বর কি বিয়ে করেছে ? না করারও কোনো কারণ নেই, এই বয়সের মধ্যে এখানকার সমস্ত লোকই প্রায় বিয়ে করে ফেলে, যজ্ঞেশ্বরও বোধহয় করেছে, তাহলে মনোরমা ওর স্ত্রীর নাম হবে। ঐদিনই সুযোগ বুঝে কথায় কথায় যজ্ঞেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার দোকানের এ রকম নাম দিলে কেন ? বিয়ে করেছো নাকি ?'

যজ্ঞেশ্বর লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেল, জিভ কেটে ফেললো। তারপর বললো, 'আরে না না, ছিঃ, ছিঃ কুমারী মেয়ের সম্পর্কে এসব কথা বলা ভীষণ অন্যায়।' কি অন্যায়, কি ব্যাপার, কিছুই বোঝা গেল না, কুমারীর নাম দিয়ে যদি মনিহারি দোকানের সাইনবোর্ড করানো যায় তাতে 'দোষ নেই। শুধু জিজ্ঞাসাতেই দোষ ?

এরপর অবশ্য যজ্ঞেশ্বরের কাছ থেকে মনোরমা সংক্রান্ত বহু তথ্যই আমি জানতে পেরেছিলাম, বিনা গপ্নে এবং প্রচেষ্টায়। সে নিজের থেকেই গল্‌গল্ করে বহু কথা বললো। মনোরমা স্থানীয় বাস-ড্রাইভারের মেয়ে, ঐ বাড়িতেই যজ্ঞেশ্বর দুপুরে ও রাতে খায় এবং সারাদিন মনে মনে মনোরমাকে প্রেম করে। মনোরমা কেমন অ্যালবার্ট করে চুল বাঁধে, মাউন্ট-

করা ব্লাউজ পরে, কেন যে এত আকাশী রঙের শাড়ি পরে, তবে আকাশী রঙের শাড়িতে ওকে মানায় ভালোই—যজ্ঞেশ্বরের এই রকম প্রাণখোলা আলোচনা শুনে শুনে আমার কৌতূহল মন অবশেষে ক্লান্ত হয়ে গেল।

মনোরমা ভ্যারাইটি স্টোরসের পর আরো বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। যজ্ঞেশ্বর সম্পর্কে প্রায় ভুলেই এসেছি। এমন সময় আবার হঠাৎই অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে গেল। দমদমের দিকে একটা বাসস্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, আচমকা যজ্ঞেশ্বর আমাকে জড়িয়ে ধরলো, 'এই তুই এখানে কি করছিস।'

এতকাল পরে যদিও চিনতে আমার অসুবিধেই হচ্ছিল ; তবু যজ্ঞেশ্বরের কথা বলার ভঙ্গিতে ধরে ফেললাম। বললাম, 'কি ব্যাপার তুমি এখানে এলে কোথা থেকে।'

দেশে কি আর কেউ আছে, চলে এলাম, ঐ গলির মধ্যে চায়ের দোকান দিয়েছি, একদিন আসিস।'

সেদিন চলে এলাম। কিন্তু ও পাড়ায় মাঝেমধ্যেই যেতে হয়, পরে একদিন খুঁজে যজ্ঞেশ্বরের দোকানে গেলাম। কাঠের বেঞ্চি পাতা ছোট, অতি দরিদ্র রেস্তোরাঁ, কিন্তু বাইরে আবার সেই ব্যাপার। ঝকঝকে সাইনবোর্ডে, দু'পাশে আঙুরের থোকার ছবি ঝুলছে, মধ্যে রক্তের অক্ষরে লেখা, 'লতা রেস্টুরেন্ট'।

এখন আর তত কৌতূহল নেই। লতাপাতাঘটিত কোনো ব্যাপারে কিছু না জেনে শুধু যজ্ঞেশ্বর এখনো বিয়ে করতে পেরে উঠেছে কিনা এই সামান্য জিজ্ঞাসা আমার। ঈশ্বর সহায়। যজ্ঞেশ্বর দোকানে নেই। একটা বাচ্চা বয় রয়েছে, এক ভাঁড় চা নিয়ে খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই তোর বাবু কোথা থাকে রে?'

'এই কাছেই।' ছেলেটি নির্বিকারভাবে যেদিকে আঙুল নির্দেশ করলো সেদিকে বহুদূর পর্যন্ত গরুর খাটাল।

আরেকটা প্রশ্ন তবুও বাকি ছিলো, তোর বাবুর বৌ কোথায় ? এখানেই আছে না দেশে ?

'বৌ আবার কোথায় বাবুর, বৌ থাকলে কি রাতদিন দোকান ফেলে ঘুরে বেড়ায়।' দশ বছরের ছেলে অত্যন্ত প্রাজ্ঞের মতো মৃদু হেসে আমার চায়ের ফাঁকা হয়ে যাওয়া ভাঁড়টা টেবিল থেকে তুলে সামনের কাঁচা নর্দমায় ফেলে দিলো।

যজ্ঞেশ্বর-কাহিনীর আর সামান্য একটু বাকি আছে। মাস ছয়েক আগের কথা। 'সেদিন কালীঘাট বাজারে গিয়েছিলাম,মাসকাবারি বাজার করতে, এক-আধদিন যাই। বাজারে ঢুকবার পথে একটা সাইনবোর্ডের তৈরীর দোকান, কি করে নজরে পড়লো একটা নতুন সাইনবোর্ড লেখা হচ্ছে। সেই রক্তের অক্ষরে, 'দশমহাবিদ্যা ভাণ্ডার—প্রোঃ যজ্ঞেশ্বর দাস।' কালীঘাট ভাণ্ডারেরই একটা ছোট দোকানের পাশে দেখি সেই সাইন-বোর্ড। দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি, ভেতরে যজ্ঞেশ্বরই বসে আছে। ভেতরে আর যাইনি।

অনুমান করি, এতদিনে দশমহাবিদ্যার শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হয়েছে।

মনে আছে

সেই এক ভদ্রলোক। সব কিছু ভুলে যেতেন। কিছুতেই কিছু মনে থাকতো না। ছু পায়ে ছজোড়ার ছুই চটি দিয়ে, উল্টো করে জামা গায় দিয়ে কতো দিন কতো সভায় নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। এতোকাল ধরে তার সম্বন্ধে অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছি। বাসে উল্টো করে জামা গায়ে দিয়ে টিকেট কিনতে গিয়ে পকেট হাত দিয়ে পাননি। করুণ ভাবে বলেছেন 'তিনটে পকেটই কাটা গেছে দেখছি, এখন বাসভাড়া দিই কি করে বলুন?' সেই ভদ্রলোকের আর একবার এক বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়লো যে, 'ছাখো, কাল রাত্তিরে না বলাইবাবুর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল, ছিঃ ছিঃ আমার যে কি হলো। যাওয়া উচিত ছিল।' অত্যন্ত ছুঃখিত কণ্ঠে তিনি বলাইবাবুকে ফোন করলেন।

'দেখুন, বলাইবাবু। একটা অত্যন্ত ছুঃখের কথা। কাল রাত্রিতে আপনার ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করবেন না। ঠিক আছে আজ রাত্রিতে আপনার ওখানে না হয় নিমন্ত্রণ খাওয়া যাবে।'

ওধার থেকে বলাইবাবুর বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'সে কি মশাই। আপনি না কাল রাত্রিতে আমার এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেলেন।'

সত্যি কথা বলতে কি আমার এই কিম্বদন্তীর ভদ্রলোকের মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কিছুই মনে পড়ে না। মাথার ভিতরটায় যে কি হয়েছে সব যেন গুলিয়ে ফেলেছি। সেই বারো বছর বয়সে পিলেজ্বর হয়েছিল। অন্নদা কবিরাজের একশো আটটা কালান্তর পিল খেয়ে পিলেজ্বর সারলো। কিন্তু তারপর থেকেই মাথার ভিতরটা একবারে খট্ খট্।

নেই যদি পরবে, তাহলে বলুন নাম ভুলে গিয়ে সমস্ত সহপাঠিনীকে দেবী বলে ডাকবো কেন? কোনো কারণ নেই। এই এখন আমার অনেক ঘটনা মনে করতে ইচ্ছে করছে। সেই সব কৌতুককর ঘটনা যদি স্মৃতি থেকে কোনোমতে উদ্ধার করা যায় তাহলে হয়তো আপনাদের সহাস্য সম্বর্ধনাও কিছুটা মিলে যায়। কিন্তু তা হবার নয়। না এই মুহূর্তে কোনো হাস্যকর কাহিনীই আমার মনে পড়ছে না; সত্যিই না, ক্ষমা করবেন।

কিন্তু যেমন মনে পড়ে না, তেমনই যেন ভোলাও যায় না অনেক কিছু। কিছুতেই ভোলা যায় না, অনেক চেষ্টা করেও যায় না। সেই একটি মৃত-দেহের বীভৎস মুখ বার বার আমার মনে আসে। বাসা থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে দাদা যে কোথায় গেল তিন দিন তিন রাত্রি কোনো খবর নেই। বেডিও, পুলিস, হাসপাতাল, খবরের কাগজ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কোথাও কোনো খোঁজ হলো না।

হাওড়া লাইনেব রেলে কে এক অজ্ঞাতনামা যুবক কাটা পড়েছে, তার গলায় পৈতে রয়েছে তাকে কি কেউ সনাক্ত করতে পাবে—সকালের কাগজে এই খবর। হাওড়া রেল স্টেশন পেরিয়ে প্রায় তিন ফার্লং পায়ে হেঁটে রেলের হাসপাতাল। তারই পেছনের দিকে একটা ডোম আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। দিনের বেলাতেও কেমন অস্পষ্ট থমথমে। মাটির উপরে ঘাসে রক্তে মাখামাখি চটের কাপড়ে ঢাকা রয়েছে একটা শব-পিণ্ড। ডোমের হাতে সময় স্বল্প। আধা দেহাতী ভাষায় সে আমাকে সেই রক্তমাখা চটের কাপড়টা টেনে তুলে দেখতে বললো, ওটি আমার পরিচিত কিনা। যদি আমার কেউ হয় তবে অন্ততঃ এই শবটির হাত থেকে ডোম রেহাই পায়। তার পরের দায়িত্ব আমার। চটটা হাত দিয়ে তুলে ধরলাম, মড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। সমস্ত ভয় ভীতি আশ-ঙ্কার ঊর্ধে যেন আমি এক মুহূর্তে চলে গেছি। ডোমকে বললাম, 'মড়াটা উল্টে দাও।' একটা পা দিয়ে শবের পিঠে ধাক্কা দিয়ে সে উল্টে দিলো।

মাথার একটা দিক গুঁড়ো হয়ে গলে গেছে আর একটা দিকে একটা চোখ খোলা তার মধ্যে কয়েকটা পিঁপড়ে ঘুরছে। এমন আত্মীয়হীন আকৃতি আর কোনো জীবিত মানুষের চোখেও আমি আর জীবনে কোনোদিন দেখিনি।

এখন দুপুর তিনটে বাজতে দু মিনিট। ঠিক তিনটের সময় আমার দুজন বন্ধু আসবে, তাদের সঙ্গে তাস খেলতে যাবো পাশের বাড়িতে। একটু আগে রেডিওতে গান শুনেছি, হাতের সামনে সচিত্র সাপ্তাহিক। কিন্তু কেন, কেন এই মুহূর্তে আমার সেই অনাত্মীয় একচক্ষু মৃতদেহের কথা মনে পড়লো!

আর একজনের কথা মনে পড়ছে। আমার বন্ধু অধীরপ্রকাশের কথা। নানা কারণে অধীরপ্রকাশ বেঁচে থাকা বিষয়টা ভালোবাসতে পারে নি, সে সব পুরনো গতানুগতিক কারণ সহজেই অনুমেয়, এখানে না বললেও চলবে। তাদের তিনতলা বাড়ির চিলেকোঠায় লেপ ঝোলাবার একটা র‍্যাক ছিল। সেই র‍্যাকের সঙ্গে গলায় দড়ি ঝুলিয়েছিল অধীরপ্রকাশ। কিন্তু এভাবে অধীরের আত্মহত্যার বাসনা সফল হয়নি। মানুষ ভাবে একরকম, ঘটে আরেকরকম। অধীরপ্রকাশের মতো এত বড় উদাহরণ বুঝি আর নেই। এমন হাস্যকর বেদনাদায়ক ব্যাপার বোধহয় বড় একটা হয় না।

পুরনো বাড়ির ভাঙা র‍্যাক। তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলা ঝুলিয়ে দিয়েছিল অধীরপ্রকাশ। কিন্তু বোধহয় তার শরীরের ভারেই সেই র‍্যাক ভেঙে দড়িসুদ্ধ সে ছিটকে পড়ে একতলার সিঁড়িতে। তিনতলার থেকে একতলায়। এর পরে পনেরো-বিশ বছর চলে গেছে। ভাঙা কোমর নিয়ে আজো হাস্যকর ভাবে বেঁচে আছে অধীর প্রকাশ।

কতো দরকারি কথা ভুলে যাই। কিন্তু এসব কথা মনে থাকে কেন?

আর কেউ কখনোই দেখতে পাবে না। শুধু মতিলাল তাকানো মাত্র তার চোখের সামনে অদৃশ্য শব্দগুলি ঝকঝক করে ওঠে।

মতিলাল সেন একজন ছোটগল্প লেখক, বয়েস একত্রিশ, এখনো উপন্যাস লেখেনি, ইচ্ছে আছে লিখে ফেলবে অচিরেই ; প্লট, চরিত্র সমস্তই মনে মনে মোটামুটি ছকে নিয়েছে মতিলাল কিন্তু প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেন্সার বোর্ড।

উপন্যাস একটানে লিখে শেষ করা একটা অমানুষিক কাজ। কোনো কোনো খ্যাতনামা, ক্ষণজন্মা লেখক যে এরকম অসাধ্যসাধন মধ্যে মধ্যে করে বসেন না তাও নয় কিন্তু মতিলালের নিজের সম্পর্কে অতো উঁচু ধারণা নেই। একটানে একটা ছোটগল্প লিখতেই তার দমবন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু আজ কিছুদিন হলো তা সত্ত্বেও মতিলাল কিছুতেই কোনো লেখা আদ্ধেক করে ফেলে রাখে না কারণ তাহলেই অদৃশ্য শব্দমালা লেখার চারদিকে ফুটে ওঠে, মতিলাল ছাড়া সেই মন্তব্যগুলি আর কারোর চোখেই পড়বে না।

মার্জিনে, কোনায় কোনায় ছোটো, বড়ো সব গোলমেলে জিজ্ঞাসা ও মন্তব্য ; এক অদৃশ্য সেন্সার বোর্ড মতিলালের অসম্পূর্ণ লেখা হাতে পেলেই তার কর্তব্য পালন করে।

এই এক মহাঝামেলা দেখা দিয়েছে তরুণ গল্প লেখক মতিলাল সেনের জীবনে। কোনো লেখা ফেলে তার আর ওঠার উপায় নেই। উঠলেই হাজার জিজ্ঞাসা ও মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হবে, যার অধিকাংশই অতি-স্পষ্ট ও নির্মম।

মতিলাল অবশ্য কিছুদিন হলো এর একটা জটিল সমাধান বার করে নিয়েছে। একটানে লেখা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া, তা হলে আর ঐ বিদঘুটে সেন্সার বোর্ড কায়দায় পাচ্ছে না কিন্তু এ ভাবে চললে মতিলাল কখনোই কোনো বড়ো লেখা শেষ করে উঠতে পারবে না। ঐ সেন্সার বোর্ডের অদৃশ্য অথচ অমোঘ হস্তক্ষেপ প্রায় মহামান্য হাইকোর্টের ইনজাংশনের মতোই মতিলালের কোনো অর্ধসমাপ্ত লেখাকে আর এগোতে দেয় না।

কার্যত কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না কিন্তু সেন্সার বোর্ডের মন্তব্য ও জিজ্ঞাসাগুলি এমন ভাবে মতিলালের দিকে তাকিয়ে থাকে যে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি, এক মন সাত সের ওজন, ক্ষীণজীবী নবীন লেখকের আর একটি পংক্তি যোগ করতেও ভরসা হয় না। দু-একবার চেষ্টা করেনি তাও নয় কিন্তু কলম নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু।

তরুণ লেখকদের জীবনে এক কালগ্রহের মতো দেখা দিয়েছে এই সেন্সার বোর্ড। কতো ভালো ভালো লেখা মধ্যপথে এসে মাঠে মারা গেছে।

বছর তিনেক আগে একটা গল্প লিখেছিলো মতিলাল, গল্পটার শেষ অংশে আর একটা কি দুটো প্যারা লিখলেই হয়ে যেতো। কিন্তু দাঁতের গোড়ায় খুব ব্যথা হওয়ায় শেষ মুহূর্তে লেখাটা ছেড়ে দিয়ে দাঁতের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়।

দুদিন ডেন্টিস্টের কাছে ঘোরাফেরা করে মতিলাল যখন কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করলো, গল্পটা হাতে নিয়ে দেখে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। আগাগোড়া ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে অসংখ্য মন্তব্যের ছড়াছড়ি। প্রথমে মতিলাল ভাবলো তার কোনো বন্ধুস্থানীয় কেউ এসে রসিকতা করে এই রকম করে গেছে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে, তার উত্তেজনা একটু কমলে, মতিলাল বেশ বুঝতে পারলো এই মন্তব্যগুলি কোনো সাধারণ মানুষের লেখা হতে পারে না। কারণ এই মন্তব্যগুলি কি যেন এক স্বচ্ছ কালিতে লেখা, যার আঁচড়গুলি শুধু মতিলালই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আর কেউ

নয়। আর কেউ যে দেখতে পাচ্ছে না, এই ব্যাপারটা মতিলাল প্রথমে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কিছুক্ষণ চলে যাবার পরে তার উপলব্ধি হলো যে অদৃশ্য পংক্তিগুলির কোনো বাস্তব উপস্থিতি নেই, চোখের সামনে সত্যিই নেই কিন্তু জ্বলজ্বল করছে কয়েকটি প্রশ্ন, কয়েকটি উক্তি।

ব্যাপারটা যাচাই করার উদ্দেশ্যে মতিলাল গল্পটা অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই দু-একজন বন্ধুকে দেখিয়েছিলো, তারা ভালোই বলেছিলো ঐ অংশটুকু সম্পর্কে কিন্তু তাদের কারোর নজরেই পড়েনি। সেন্সার বোর্ডের মন্তব্যগুলো পড়লে নিশ্চয়ই তাই নিয়ে আলোচনা করতো।

মতিলাল নিজেও ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলো কারণ সে বুঝেছিলো ব্যাপারটা সকলের চোখেই নেহাৎ হাস্যকর বা পাগলামির লক্ষণ বলে মনে হতে পারে। অতোটা খেলো হওয়ার ইচ্ছা মতিলালের একেবারেই নেই, তা ছাড়াও আর একটা কথা ছিলো, সেন্সার বোর্ডের মন্তব্যগুলো এতো তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট মনে হয়েছিলো তার কাছে যে সে কিছুতেই এগুলো লোক জানাজানি করতে দিয়ে সুখী হতো না।

বহুদিনের অনুশীলনে এবং যথেষ্ট বুদ্ধি ব্যয় করে মতিলাল বুঝতে পেরেছিলো, এই রহস্যময় সেন্সার বোর্ডের সদস্য মাত্র দুজন, দুজনকেই চিনতে পেরেছিলো সে কিন্তু তাদের হাত ছাড়াতে পারেনি। তাদের ইঙ্গিতময় মন্তব্যগুলি কখনো অব্যক্ত গ্লানিতে, কখনো জ্বালায় তাকে দগ্ধ করতো। কিন্তু এতোই ব্যক্তিগত ব্যাপার সেসব যে তার ব্যাখ্যা কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেওয়া অসম্ভব।

যেমন ধরা যাক, সরস্বতীর কথা। ঐ গল্পে মতিলাল সরস্বতী নামে একটি মেয়ের কিঞ্চিৎ দেহবর্ণনা করেছিলো, সেই বর্ণনায় গল্প লেখকের কামলোলুপতার স্পষ্ট ছাপ ছিলো। এই বর্ণনার পাশে সেন্সার বোর্ড শুধু একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখেছিলো :—

সরস্বতী না শুক্লা?

আপাতদৃষ্টিতে, যারা জানে না, তাদের কাছে এই রকম একটি মন্তব্যের কোনো মানেই নেই। কিন্তু মতিলালের কাছে এটি একটি নির্মম প্রশ্ন, নিজের অবচেতন মনে যে প্রশ্নের খোঁচা তাকে গত আট বছর ধরে ক্ষত-বিক্ষত করছে।

সরস্বতী অর্থাৎ সত্যিই শুক্লার সঙ্গে মতিলালের যে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক তাতে কামলালসার কোনো ক্ষীণতম বুদ্বুদ পর্যন্ত মনের মধ্যে ওঠা প্রায় মহাপাপ ; সুতরাং সরস্বতী না শুক্লা, এই মন্তব্যটি মতিলালের ক্ষেত্রে যথাযথ ও মারাত্মক।

এর পরে যতোবারই মতিলালের অসম্পূর্ণ গল্পে সেন্সারের হাত পড়েছে এবং যেখানেই কোনো ডগমগ নায়িকার বর্ণনায় মতিলাল সাবলীল হয়ে উঠেছে, পাশেই একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য দেখা গেছে—মালতীদি না শুক্লা ? মলিনা না শুক্লা ?

নানা সময়ে মতিলাল ঠাণ্ডা মাথায় বসে বসে ভেবেছে, এই শুক্লা-কাহিনী সে ছাড়া আর কে জানতে পারে, এ তো নিতান্ত ব্যক্তিগত মনের গহনতম ব্যাপার। তার এই মানসিক লালসার কোনো সাক্ষী নেই, কোনো সঙ্গী নেই তবে আর কে, কে হতে পারে ?

হঠাৎ একদিন বিদ্যুৎচমকের মতো মতিলালের শিরায় স্নায়ুতে একটি তীক্ষ্ণ অনুভূতি দ্রুত খেলে গেছে, তাহলে, শুক্লা, শুক্লাও কি আমার এই গোপন কামনার কথা টের পেয়েছিলো ! নিশ্চয়ই শুক্লা। যতোবার এই কথা ভেবেছে, মতিলালের কান লাল হয়ে উঠেছে, নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

মতিলাল স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে এই মন্তব্য শুক্লা ছাড়া আর কারও নয়। এই ভাবে একদিন মতিলাল সেন্সার বোর্ডের এক নম্বর সদস্যকে আবিষ্কার করলো এবং যথেষ্ট সাবধান হয়ে গেল। অর্থাৎ তার গল্পে এতোকাল যে একটি রক্তমাংসের মেয়েকে দেখা যেতো সে চিরকালের মতো বিদায় নিলো। তবুও কিন্তু রেহাই পেলো না মতিলাল, এরপর থেকে

প্রশ্ন হতে থাকলো, 'কই, শুক্লা কি হলো ?'

এর পর এলেন ভি. এম. স্যার। ভি· এম· এই সংক্ষিপ্ত আদ্যক্ষর দুটি ঠিক কি অর্থের বাহক ছিলো সেটা আজও মতিলালের জানা নেই। পুরনো আমলের কোনো কোনো ইস্কুলে একজন করে এই পদবীর শিক্ষক থাকতেন। মতিলাল লেখাপড়া করেছিলো মতিগঞ্জ হরবাসিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সেই মতিগঞ্জ ইস্কুলে সাদাতুল্লা খান নামে একজন ছিলেন ভি. এম. স্যার।

সেই খুব ছোটবেলায় যখন ইস্কুলে প্রথম ভর্তি হয়েছিলো, ছয় সাত বছর বয়সে, ক্লাস থ্রীতে তখন একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় মুসলমানী টুপি, একটু লাল-লাল চোখ ভি· এম· স্যার মৌলভী সাদাতুল্লা খানকে খুবই ভয় পেতো মতিলাল। ভি· এম· স্যার আবার ছিলেন ক্লাসটিচার, দৈনিকের প্রথম ক্লাস তাঁর ভাগে। এক বছর এই ভাবে গিয়েছিলো, কিন্তু তাতেও তার ভয় পুরো কাটেনি।

ভি. এম. স্যারও জানতেন কিছু কিছু ছোট ছেলে অনিবার্য কারণেই তাঁকে ভয় পাবে এবং তিনি কিঞ্চিৎ এর সুযোগ গ্রহণ করতেন। প্রত্যেক বছরই ক্লাসের একটি বা একাধিক ছেলের তিনি 'ছিঁচকাঁদুনে ফেচু' নামকরণ করতেন। তিনি একটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গি সহকারে গলার স্বর বিকৃত করে ছিঁচকাঁদুনে ফেচুকে ধরতেন। অন্যান্য সহপাঠী শিশুদের এতে যথেষ্টই আমোদ হতো এবং আসামীও যথেষ্ট নিগৃহীত বোধ করতো।

বলা-বাহুল্য, বছরের গোড়াতেই মতিলাল স্বীয় প্রতিভায় ভি· এম· স্যার প্রদত্ত এই বার্ষিক খেতাব লাভ করেছিলো।

মতিলাল সেন আজ তার অনেক বয়েস, এ সব ঘটনা প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেকার। সে ভুলেই গিয়েছিলো সেই নদীর ধারে করোগেট টিনের চালার নিচে হরবাসিনী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং তার ভি. এম. স্যারের কথা, সে যেন কোনো অন্য জন্মের ব্যাপার।

বহুদিন পরে এই সব স্মৃতির টুকরো হঠাৎই আবার ফিরে এলো, হঠাৎ যখন একদিন মতিলাল তার গল্পের পাশে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেয়া একটি মন্তব্য দেখলো 'ছিঁচকাঁদুনে ফেচু'।

এতোদিন পরে হলেও এক মুহূর্তে তার সেই শৈশবকাল তার সমস্ত গ্লানি, অপমানবোধের অসহায় নিরর্থক ব্যাপারগুলি মতিলালের কাছে আবার ফিরে এলো। সাত বছরের মতি আর একত্রিশ বছরের শ্রীমতিলাল সেন একই মন্তব্যে একই রকম অপমানিত বোধ করলো।

যে কোনো লেখককেই, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, দু'একটি স্টকের উপরে নির্ভরশীল হতে হয়। মতিলালের এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মেছিলো করুণ কাহিনীর বর্ণনায়। তার মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল একদিন সে বিভূতিভূষণের মতো কারুণ্যের আবেগে পাঠককে মুগ্ধ করে দেবে। কিন্তু একদিন যখন এইরকম একটি বর্ণনার পাশে অদৃশ্য মন্তব্য বসলো 'ছিঁচকাদুনে ফেচু', মতিলাল একেবারে অসহায় হয়ে পড়লো।

গল্পটি আর এক বিন্দুও গড়াতে পারলো না। একটি শব্দ যোগ করতে গেলে বিরাট দ্বিধা, সংশয়, প্রত্যেক মুহূর্তে কানের কাছে কোন্ যুগের ভি. এম. স্যারের পরিহাস-বিকৃত কণ্ঠস্বর, 'কিরে ছিঁচকাঁদুনে'?'

ভি. এম. স্যার ও শুক্লা সেন্সার বোর্ডের এই দুই সদস্য মতিলালের জনপ্রিয়তার দুটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আদিরস ও করুণরস এই দুটি বিষয় কিছুতেই মতিলাল জমিয়ে তুলতে পারছে না।

একটানে লিখে গেলে হয়তো হয় কিন্তু তাতেও একটা পাপ-পাপ ভাবের কাঁটা মনের মধ্যে আজকাল খচখচ করে।

এছাড়া নতুন একটা দুশ্চিন্তা যোগ হয়েছে মতিলালের জীবনে। তার কেবলই ভয় হয় সেন্সার বোর্ডের সদস্যসংখ্যা হয়তো ক্রমশঃ বেড়ে যাবে, শুক্লা এবং ভি. এম. স্যারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তখন অন্য আর কারা থাকতে পারে এবং কি কি মন্তব্য করতে পারে মনে মনে তার নিশানা

করতে গিয়ে পাগলবনার অবস্থা হয়েছে তার।
আজকাল মতিলাল মধ্যে মধ্যে ভাবে, গল্প লেখাই ছেড়ে দেবে

বনফুলের মালা

অনেকদিন আগে এক প্রবল বৃষ্টির দিনে একটি এগারো বছরের দুঃখিনী মেয়ে বনফুলের মালা গেঁথে রথের মেলায় বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিলো। সেদিন ঝড়জলে সে মেলা ভেঙে যায়, রথের টান অর্ধেক না হতেই প্রবল বৃষ্টি নেমেছিল। রাধারানীর বনফুলের মালা কেনার কোনো লোক পাওয়া গেল না। তারপর বৃষ্টিঘন নিশীথের পিচ্ছিল অন্ধকারে রাধারানী পথ হারিয়ে তার সেই বনফুলের মালা বুকে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে অনেকদিন, অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে। রথযাত্রার আনন্দ উৎসবের মধ্যে বহুদিন আগের সেই বনফুলের মালার ম্লান গন্ধ এখনো উন্মনা করে তোলে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাহেশের রথের কথা লিখেছিলেন তাঁর 'রাধারানী' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে। মাহেশের রথ আমি দেখিনি দেখা হয়ে ওঠেনি। শ্রীধাম পুরীর জগৎবিখ্যাত রথযাত্রা কিংবা কাছাকাছি গুপ্তিপাড়ার মেলাতেও আমার কোনোদিন যাওয়া হয়নি। এর জন্যে আমার মনের গভীরে বিশেষ কোনো দুঃখ আছে তাও নয়। অত হইচই ভিড়ভাট্টা কেমন যেন পোষায় না এ বয়সে আর।

রথযাত্রা দর্শনের পুণ্যের প্রতি এই অনাসক্তি, এতে যদি আমার কোনো পাপ হয়ে থাকে প্রভু জগন্নাথ দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

তবু যে রথযাত্রায় যাওয়া হয়নি, এ জীবনে আর যাওয়া হবে না বলে আমার মনে চিরদিন দুঃখ রয়ে গেল, সে হলো ধামরাইয়ের রথ।

আমাদের ছোটবেলায় প্রত্যেক বছরই বর্ষার আগে আমাদের বাড়িতে তুমুল আলোচনা হতো, এবার আমরা নিশ্চয়ই ধামরাইয়ের রথে যাচ্ছি, কিন্তু যথারীতি কোনোবারই শেষ পর্যন্ত যাওয়া হতো না।

ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামের রথের মেলা সমস্ত পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত, যেমন মাহেশের রথ এপাশে। আমার ঠাকুমাকে নিয়ে আমার প্রপিতামহী সে রথে গিয়েছিলেন বিয়ের পর নতুন বৌকে জগন্নাথ প্রণাম করাতে, সে বোধহয় একশো বছর আগে। তারপর আমার মাকে নিয়ে আমার ঠাকুমাও গিয়েছিলেন একই যাত্রায়, সেও পঞ্চাশ বছর।

ধামরাইয়ের রথের মেলা আমি স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু তার স্মৃতিকথা শুনেছি। পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল থেকে আদি রথের বেশ কিছুদিন আগে হতেই হাজার হাজার নৌকোয় গৃহস্থ পরিবারের নারী, বৃদ্ধ, শিশুসহ রওনা হতো মেলার উদ্দেশে। কারও তিনদিনের পথ, কারও সাতদিনের পথ, কারও বা তারও বেশি। ধলেশ্বরী, যমুনা, পদ্মা কতো বড় বড় নদী, আর আশ্চর্য সব নামের ছোট নদী আর দিগন্তপ্রসারী বিল পাড়ি দিয়ে তারা এসে পৌঁছাতো। সেখানে উল্টোরথ পর্যন্ত এবং হয়তো বা তারও পরে কিছুদিন কাটিয়ে সবাই ফিরে আসতো স্বগ্রামে।

দূরদূরান্ত থেকে পসারীরা আসতো গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র সব পণ্য নিয়ে, যেত ঢাকা আর কলকাতা থেকে শখের মনোহারী দোকান। নৌকোয় নৌকোয় রান্না হতো টাটকা ধরা ইলিশ কিংবা অন্য কোনো মাছ, আর খিচুড়ি। সঙ্গে থাকতো প্রচুর কাঁঠাল। আর ফজলি আমের জাহাজী নৌকো আসতো তেরো নদী পার হয়ে মালদা থেকে।

আমার জীবনে প্রাপ্যের কোনো অভাব নেই তবু এরই মধ্যে নিতান্ত যে সব স্বপ্ন সফল হয়নি, যে সব দুঃখ আর কোনোদিনই পূরণ হবে না তার মধ্যে এই একটি হলো ধামরাইয়ের মেলায় না যাওয়া। আমি বড় না হতে হতে দেশ বিভাগ হয়ে গেল, তার আগে এক বছর গেল বন্যা, পর পর দু বছর মন্বন্তর। আর দেশবিভাগের পরে ধামরাইয়ের জলপথ

তেমন নিরাপদ ছিল না। মেলার গৌরবও ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। পূর্ববঙ্গের হিন্দু গৃহস্থ পরিবারের কাঠামো ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ধামরাইয়ের রথের উৎসব ম্লান হয়ে এসেছিল।

এতোদিন পরে আজ আর জানি না সে মেলা এখনো বৎসরান্তে বসে কি না।

যে রথের মেলার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল সে হলো সন্তোষের রথের মেলা। সন্তোষ টাঙ্গাইলের পাশেই সন্তোষের মহারাজার প্রাসাদ ও মন্দিরমুখী একটি মাঠে একটি বড় কাঠের রথকে কেন্দ্র করে বৎসরান্তে সাপ্তাহিক উৎসব জমে উঠতো।

টাঙ্গাইলের শহরেব মধ্যে একটা লম্বা খাল শহরকে দু ভাগ করে রেখেছে। সেই খাল থেকে আমরা নৌকো ভাড়া নিতাম। বাঁশের ছই দেয়া ঢাকাই নৌকো। খুব বড় নয়, জলের উপরে সেটা দুলতো ক্রমাগত, অল্প বয়সে বেশ ভয়ই হতো।

আবার যে সব বছর ব্যবসায় অনেক লোকজন হতো, আত্মীয় কুটুম এসে যেতো এবং সেই সঙ্গে খালে যথেষ্ট জল থাকতো পানসি নৌকো ভাড়া করা হতো। বৃষ্টি না হলে সে নৌকোর ছাদেও অনেকে বসে যেতো পারতো। প্রয়োজন মতো পাড়াপ্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হতো রথযাত্রায় আমাদের সঙ্গে নৌকো ভ্রমণের জন্যে।

টাঙ্গাইলের খাল ধরে শহর বরাবর গিয়ে নৌকো পড়তো কাগমারিতে লৌহজঙ্গ নামে এক ছোট নদীতে। এই সেই বিখ্যাত কাগমারি, 'শালিধানের খই আর কাগমারির দই' ছড়ার ভিতরে যে অমর হয়ে আছে। আরও পরে আধুনিক কালে ভাষানির মৌলানার জন্য বিখ্যাত কাগমারি। লৌহজঙ্গ পাড়ি দিয়েই কাগমারির মধ্য দিয়ে সন্তোষের খালে, সেখানে তখন নৌকায় নৌকারণ্য।

টাঙ্গাইল থেকে সন্তোষ, মাত্র দু-তিন মাইল জলপথ কিন্তু আমার শৈশব-

কৈশোরের সেই নৌকাভ্রমণ আজ পর্যন্ত তার তুল্য আনন্দময় আর কিছু আমার জীবনে ঘটেনি।

নৌকোর ছই কিংবা পানসির ছাদের উপর বসে মৃদু চলমান প্রতিদিনের চেনা টাঙ্গাইলের সদর রাস্তা পেরিয়ে মানদায়িনী সিনেমা হলের পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে বর্ষার ভরা লৌহজঙ্গের জলে। লৌহজঙ্গ ছোটো কিন্তু সে নদী নয় নদ, লৌহজঙ্গ নদ। এ বছর টাঙ্গাইল গিয়ে দেখলাম সে নদী মজে, গতি হারিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, সে আর নদী নেই। কিন্তু এক কিশোরের সুদূর স্মৃতিতে সে আজও চঞ্চল উচ্ছল।

বন্যার বছরে লৌহজঙ্গকে বিরাট, বিশাল মনে হতো। তখনো আমি সমুদ্র দেখিনি, ভাবতাম সমুদ্র হয়তো এই রকম।

'লৌহজঙ্গের মাঝবরাবর, তখন আমি খুব ছোট, খুব ভয় পেয়ে নৌকোর মাঝি যে বৈঠা ধরে বসেছিল, তাকে বলেছিলাম, 'আমার কেমন ভয় হচ্ছে। ডাঙা এখান থেকে কতদূর। প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।' আমার কাকা আমার ঠিক পিছনে বসেছিলেন, তিনি বললেন, 'এখান থেকে ডাঙা মাত্র দশ-বারো হাত।' কথাটার মানে পরে বুঝেছিলাম, পার যতোদূরেই থাক না কেন, জলের নিচের মাটি দশ বারো হাতের চেয়ে বেশি তাহলে ছিলো না।

লৌহজঙ্গ পার হয়ে বেনুবনচ্ছায়াঘন কাগমারির মধ্য দিয়ে নৌকো চলেছে, ছোট খাল, এ বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে ও বাড়ির তুলসীমণ্ডপ ছুঁয়ে সন্তোষে প্রবেশ। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মেলার হইহট্টগোল, খোল-করতালের শব্দ, তালপাতার বাঁশির আওয়াজ।

সন্তোষের রথের মেলায় কিন্তু পাঁপড় পাওয়া যেতো না। তেলেভাজাও পাওয়া যেতো না। তেলেভাজা নামক বস্তুটির স্বাদ পাই কলকাতায় এসে। পেঁয়াজি ফুলুরি ইত্যাদি টাঙ্গাইলে কল্পনা করাও যেতো না। এখনও পাওয়া যায় না।

তবে জিলিপি ছিল। আমরা বলতাম জিলাবি। আর ছিল বিন্নি ধানের

সুগন্ধি বেলফুলের মতো খই এবং চিনির সাজ—রথ হাতি ঘোড়া নানা আকারের শুকনো শক্ত মিষ্টি।

তবে খই বা মিষ্টি নয় রথের মেলার সঙ্গে মধুরে মধুর হয়ে জড়িত হয়ে আছে যে স্বর্গীয় খাদ্যদ্রব্যাদির স্মৃতি সেটি একটি অপার্থিব ফল—নাম নটকা। নটকার মতো অমন অম্লমধুর ফল কদাচিৎ কোথাও পাওয়া যাবে। বহুদিন সে ফল কোথাও দেখিনি, ডুমুরের মতো গোলাকার, শক্ত খোসা, মধ্যে তিনটে কি চারটে কোয়া, কালো বিচি, পাকলে গোলাপি আভা দেয় সবুজ ফলে।

দেশের রথের মেলার সঙ্গে নটকা গায়ে-পিঠে জড়িয়ে আছে, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম্যছড়ায় সে ফল ঢুকে গেছে,

আগ রথে যামুনা ভাই
পাছ রথে যামু
আমায় তোমায় পয়সা দিয়া
নটকা কিনা খামু।

কোনো কোনো বছর অঝোর বৃষ্টিতে ভেসে যেতো রথের মেলা। জল-ঝড়ের মধ্যে শুধু কয়েকজন অটল ভক্ত মেলার প্রাঙ্গণে মোটা দড়ি দিয়ে গভীর কাদাজলে কঠোর পরিশ্রমে জগন্নাথের অচল রথ টেনে নিয়ে যেতো। সেবার আর আমাদের ঠাকুর দর্শন করা হতো না, মেলার মাঠে আমদের নামা হতো না, আমরা ছইয়ের উপরে ছাতা মাথায় দিয়ে উঠে দূর থেকে জগন্নাথের রথের চূড়া দর্শন করে কপালে হাত ঠেকাতাম। আশপাশের নৌকোয় নৌকোয় চলতো কেনাবেচা। নটকা, বিন্নি, সাজ সবই কেনা হতো জলের উপরে নৌকোয় বসে কিন্তু মেলার মাঠে নামা হতো না।

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে। বহুদিন আগের এক বনফুলের মালায় ম্লানগন্ধ বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভেসে আসে। একাকার হয়ে যায় মাহেশ ও সন্তোষ, বৃষ্টি ও রথযাত্রা স্মৃতি ও উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের

রাধারানী অখ্যাত এক গ্রাম্য নদীর তীরের এক ভাঙা মেলায় বৃষ্টিজলে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে বনফুলের মালা হাতে একা একা অঝোরে কাঁদে। এখনো কাঁদে।

আনন্দময়ীর বিসর্জনে

আনন্দময়ী কোনোদিন জানতে পারলেন না, ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না আমরা কতো দুঃখে আছি, সারা বছর কতো দুঃখে থাকি।
সারা বছর আমাদের যায় আধপেটা খেয়ে, ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় দালালি, উঞ্ছবৃত্তি ও তঞ্চকতায়।
আনন্দময়ী এসব কখনো জানতে পারেন না। তিনি এসে দেখেন আমরা ভালমন্দ খাচ্ছি। আমাদের উৎসবমুখর দিন, আমাদের আনন্দোজ্জ্বল পোশাক। বছরের চারটে দিন আমরা হাসিমুখে, সেজেগুজে থাকি।
আমাদেরই হিসেবে গোলমাল। আমাদেরই ভুল। জগজ্জননী এসে আমাদের দেখে, আমাদের আলো হাসি, উচ্ছলতা দেখে, গান বাজনা শুনে ভাবেন এরা তো বেশ ভালো আছে। তাই আমাদের দুর্গতি মোচন হয় না। আমাদের দুর্দশা দূর হয় না। সারা বছর জুড়ে যে আমাদের নিষ্প্রদীপ, অর্ধাহার, অসুখ ও গ্লানি আনন্দময়ী তা কখনো জানতে পারেন না। তিনি দেখেন আমরা আনন্দে আছি, সুখে আছি, আলো-উজ্জ্বলতা দেখে হাসিমুখে কৈলাসে ফিরে যান।
বছরের এই মহার্ঘ্য চারদিন আমরা যদি যেমন সারা বছর খাই পরি সেরকম খারাপ খেতাম, খারাপ থাকতাম, খারাপ পরতাম মা জননী হয়তো আমাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতেন কিন্তু তিনি তো জানতেই পারেন না।

পূজো শেষ। আনন্দময়ীর বিসর্জন হয়ে গেছে। মা জননী স্বর্গে ফিরে গেছেন। সেই সঙ্গে ফিরে আসছে আমাদের পচা চাল, লোডশেডিং, আটপৌরে পোশাক। আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের নিতান্ত আটপৌরে দৈনন্দিনতায়।

একেকটা পূজো যায়। জীবনের আয়ু থেকে একেকটা বছর সাদা মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে অনন্তে মিশে যায়। আমাদের মাথার চুলে পাক ধরে, দাঁতের গোড়া নড়ে ওঠে, আমাদের কপালে আরো একটা নতুন রেখা যোগ হয়। চোখের চশমার কাঁচ বদল হয়। বিছানার পাশে টুলে হাতলভাঙা কাপ উঠে আসে, তার মধ্যে ভেজানো থাকে নকল দাঁত। কারো পরচুলা ঝোলে মশারির পাশে পেরেকে।

সুতরাং বয়েস বাড়ছে। চশমা, সাদা চুল, স্থূলোদর। ক্রমশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক নিয়মে এটা হবেই। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু প্রতিবার পূজোর সময় এই বয়েস বাড়ার ব্যাপারটা এতো বেশি করে ভাবায়, বছরের আর কোনো সময় এমন হয় না। বিসর্জনের ঢোলের বাজনায় ঢ্যাম কুড় কুড়, ঢ্যাম কুড় কুড় বেজে ওঠে। 'আরেকটা বছর এমনি গেল, আরেকটা বছরও এমনি গেল।' মহালয়ার শেষ রাতে শুরু হয়ে যায় স্মৃতি বেদনা, তারপর বিসর্জনের গঙ্গায় দেবী প্রতিমার সঙ্গে ভাসান হয়ে যায় জীবনের আরেকটা দায়সারা বছর। অসফল তিনশো পঁয়ষট্টি দিন।

এ সব ইনিবিনি দুঃখের পুরনো কথা থাক। বরং দু'একটা রঙীন গল্প বলি।

মহানবমীর দিন অবশেষে বাধ্য হয়ে বাড়ির সকলের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। উত্তর কলকাতায় এক লোকগিজগিজ মণ্ডপের বাইরে একটি বছর আষ্টেকের ছেলেকে দেখি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা আলোর খেলার দিকে। টুনি বাল্‌ব দিয়ে একটা ফুটবল খেলার গোল হওয়ার দৃশ্য—সেটা সে অতি উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে

দেখছে। এমন সময়ে লাউড স্পিকারে শোনা গেল, 'অনল, অনলকুমার চক্রবর্তী বয়েস সাড়ে আট বছর, বুড়ো শিবতলা থেকে এসেছো…' ছেলেটি মাইকে এটুকু ঘোষণা শুনেই, আমি ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ির লোকজনের প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো, তারপর আপন মনেই বলে উঠলো 'এই যা, আবার আমি হারিয়ে গেলাম'।

পরের ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত জটিল। সেটি ঘটলো দক্ষিণ কলকাতায়। যথারীতি মণ্ডপের বাইরে ততো মারাত্মক ভিড় না, এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, এমন সময় এক ভদ্রমহিলা সামনের দিকে এগিয়ে এলেন।

ভদ্রমহিলাকে দেখে চেনা চেনা মনে হলো। অনেকদিন আগে পরিচয় ছিল। দক্ষিণ কলকাতার এক শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। দশ-বারো বছর আগে কিছুদিন আমার ছেলে আমার কাছে পড়েছিল।

শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া আমাকে দেখে ভদ্রতার খাতিরে এগিয়ে এলেন। নিশ্চয়ই আমাকে দেখেও চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু এ কয় বছরে আমি অনেক স্থূল, ভারিক্কি এবং বুড়োটে হয়ে গেছি। ঠিক আমার সামনে হাসিমুখে এগিয়ে এসে তারপরে ভদ্রমহিলা কেমন থমকিয়ে গেলেন, তাঁর হয়তো খটকা লাগলো আমি সেই একই ব্যক্তি কিনা কিন্তু ততক্ষণে তাঁর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তাঁকে মুখ খুলতেই হলো। কিন্তু তিনি যা বললেন তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি মার্জনা চেয়ে জানালেন, দেখুন কিছু মনে করবেন না। বোধহয় আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম, আপনি বোধহয় আমার আগের এক বাচ্চার বাবা।

পুজো এলো এবং চলে গেল। যেমন চিরকাল আসে আর যায়। ঝড়ের মতো আসে, ঝড়ের বেগে চলে যায়। নবমীর নিশি বড় দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। অনেকদিন আগে এক আধুনিক কবি লিখেছিলেন—

বোধনের ঢুলি বাজাবেই শেষে
বিসর্জনের বাজনা
থাক থাক সে তো আজ নয়
সে তো আজ নয় আজ নয়।

কিন্তু থাক থাক করে কিছুই কি ধরে রাখা যায়? কিছুই কি ধরে রাখা যাবে?

তা যাবে না। ঢাকের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যায়। শূন্য মণ্ডপে সঙ্গীহীন ক্ষীণ প্রদীপশিখা স্মরণ করিয়ে দেয় গত দিনের উৎসব রজনীর কথা। বাতাসে আরেকটু হিমেল ভাব, শরতের শেষ শেফালি ঝরে পড়েছে অনাদরে ধুলোভরা রাস্তায়। পুরনো গৃহস্থবাড়ির ছাদের শিখরে জ্বলছে কোনো সনাতন পৃথিবীর অমল আকাশপ্রদীপ।

খবরের কাগজ আর আবহাওয়ালাদের ঝড়বৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণ করে চমৎকার সৌরকরোজ্জ্বল শারদীয়া ছিল এবার। ছিল নিবিড় নীল চন্দ্রতারকাখচিত হিমের পরশ মেশানো রাত্রি। আর সবচেয়ে আরাম ছিল সকালবেলাগুলোয়, প্রভাতী খবরের কাগজ ছিল না। কি শূন্যতা, কি শান্তি।

পূজোয় আমি চেষ্টা করে ভালো থাকি। ভালো থাকার প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরী হলো দ্রব্যমূল্যাসুরের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা।

এর আমি একটা ছোট সমাধান বার করেছি। অতি প্রয়োজনীয় নয় এমন কোনো জিনিস পূজোর সময় কিনি না। আর কাপড়চোপড় কিনি সরকারি বা খাদিব দোকান থেকে। মহাষ্টমীর দিন হাজীর দোকানে লাইন দিয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি মাংস কিনতে যাই না। বিজয়া দশমীর দিন ষাট টাকা দিয়ে ইলিশ মাছ কেনার জন্য মারামারি করি না।

ফলে উত্তেজনা কিছু কম থাকে। যথাসাধ্য ঘরে বসে পূজোর কাগজ, পুরনো না পড়া বই পড়ে একটু আরাম আয়েসে থাকার চেষ্টা করি।

পারতপক্ষে বেরোই না। তবু দিন বড় বেশি তাড়াতাড়ি যায়। পুজোর পরে যথারীতি যেমন ছিলাম দ্রুত তেমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। কোনো প্রভেদ হয় না। শুধু দিন আরেকটু ছোট, রাত আরেকটু ঠাণ্ডা। কলকাতার জীবনের তার একটু নিচুতে বাঁধা।

একদা এক বিদেশী কবরখানায় এক সমাধিফলকে লেখা দেখেছিলাম, 'আমি জানতাম এরকম হবে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি সেটা ভাবিনি।'

প্রত্যেকবার পুজোর পরে ঐ সমাধিফলকের কথা আমার মনে পড়ে। জানতাম আরেকটা পুজো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে সেটা ভাবিনি।

শুভ বিজয়া।

প্রত্যাবর্তন

রেলের টাইমটেবিলে রেলপথের যেমন একটা ম্যাপ থাকে, খুব সম্ভব যাযাবর পাখিদেরও মনে মনে সেই রকম একটা ম্যাপ আছে। একই পথে বছরের পর বছর তাদের যাতায়াত। এই রকম একটা আকাশ পথের নিচে কলকাতা থেকে কিছু দূরের একটা ছোট বাড়িতে আমি কয়েক বছর বাস করেছিলাম।

সেখানে শীতের দিনে যথারীতি খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার হতো। ইলেকট্রিক আলোহীন, অচঞ্চল অকর্মণ্য রাত্রিতে সকাল সকাল শুয়ে পড়াই একমাত্র কাজ ছিল। ফলে ঘুম ভাঙতো খুব ভোরে।

শীতের প্রথম দিকে এই রকম কোনো কোনো ভোরবেলায় হঠাৎ দ্রুত হাততালির শব্দ শোনা যেতো। মনে হতো দূরে কোনো বিরাট সভায় খুব করতালি পড়ছে। আসলে তখন বহু দূরের কোনো বরফের দেশ

থেকে যাযাবর পাখিদের ঝাঁক আসছে কলকাতার আশেপাশে খালে বিলে।

এরই কয়েক মাস পরে গরমের শুরুতে ফেরবার পালা।

পাখিদের এই বাৎসরিক যাতায়াতের সাক্ষী হওয়া আমার প্রায় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম দেখতে গিয়ে কখনো কখনো চোখে পড়েছে দু' একটা পাখি ছিটকে পড়ে গেল নিচে, দুটি অক্ষম ক্লান্ত ডানা আর উড়তে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বিরাট দলের সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যেমন উড়ে যাচ্ছিলো তেমনই যাচ্ছে।

এক দিন আমারই চোখের সামনে বাড়ি উল্টোদিকের বড় নালায় একটা যূথভ্রষ্ট পাখি ঝুপ করে পড়ে গেল। জলকাদায় ডানার ঝাপটানি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললাম পাখিটাকে। সাদা-কালোয় মেশানো বকের মতো নরম, তুলতুলে একটা পাখি। তারপর সেই পাখিটাকে আলতো করে তুলে এনে আমার ঘরের মধ্যে একটা বাঁশের ঝুড়ির নিচে ইট চাপা দিয়ে রাখলাম।

স্নান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারাদিন কাটিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরেছি তখন সকালের সেই পাখিটার কথা আমার মনেও ছিল না। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকে দরজা খুলতেই ঝুড়ির নিচে ঝটপট শব্দ শুনে পাখিটার কথা মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ঝুড়িটা তুলে দিলাম।

ভোরবেলার সেই নির্জীব পাখিটা এতক্ষণে গায়ে যেন একটু বল পেয়েছে, হঠাৎ একটা ঝাপটা দিয়ে পাশেই আলমারির উপর উঠে বসলো। শীতের দিন। জানলা বন্ধ ছিলো, ঘরে ঢুকেই দরজাও ভেজিয়ে দিয়েছিলাম, না হলে হয়তো বাইরের অন্ধকারেই চলে যেতো।

আমি ঠিক করলাম কাল সকালেই পাখিটাকে উড়িয়ে দেবো, না হলে এখন বেরিয়ে গেলে শেয়ালে বা বিড়ালে খেয়ে নেবে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাখিটাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু পাখিটা গেল না, একটু

উঠেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভয় পেয়ে আমার বাড়ির ছাতের উপর ঘুরে এসে বসলো।

পাখিটা আর গেল না। সারাদিন বাড়ির সামনের নালাটার পাশে কি সব খুটখাট করতো কিছু হয়তো পোকামাকড় ধরেটরে খেতো। সন্ধ্যার পরে আমি যেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকতাম সেও ঢুকে পড়তো, ঢুকেই সেই আলমারির মাথায়।

এইভাবে প্রায় তিন চার মাস গেল। শেষের দিকে আমি বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েই পড়েছিলাম। এক রাত্রির জন্যেও কলকাতায় এসে থাকা সম্ভব ছিল না। একটা বাজে দায়িত্ব বলে মনে হতো পাখিটাকে। এদিকে পাখিটার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি। দিনের বেলায় আমি এবং আমার ঘর সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণই উদাসীন। স্বজন-বান্ধবহীন, অপরিচিত বিদেশে আমি শুধু তার রাত্রির আশ্রয়দাতা।

সারারাত চুপ করে আলমারির মাথার উপরে বসে থাকতো পাখিটা কিন্তু একদিন ভোরের দিকে ভীষণ পাখার ঝটপটানি শুরু করলো। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে আমি একটা জানলা খুলে দিলাম। তখন শীত শেষ হয়ে এসেছে এবং জানলা খুলতেই বহু দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ঝাঁকের শব্দ ক্ষীণ শুনতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে উঠোনে চলে এলাম, পাখিটাও উড়ে বেরিয়ে এসে ছাদে বসলো। যতই পাখির ঝাঁকের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগলো ততই ছাদের এতদিনের দলছুট পাখিটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তারপর পাখিদের সেই বিরাট প্রসেশন যখন ঠিক মাথার উপর এসে গেল, আমার পাখিটা আর একটুও দ্বিধা না করে একবারও নিচের দিকে না তাকিয়ে উড়ে গিয়ে ঝাঁকের মধ্যে মিশে গেল। দু মিনিটের মধ্যে আকাশ ফাঁকা, শুধু বহু দূরে তখন একটা ক্ষীণ পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

রাশিপুরম কে লক্ষ্মণ

এক বিশালদেহী পালোয়ান পেশী ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশেই এক জোড়া মুগুর আর ডাম্বেল। তাঁর সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আরেকজনকে বলছেন, 'উনি অবশেষে রাজি হয়েছেন। যাক এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, এতদিনে একজন শক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর পাওয়া গেল।'

অথবা,

এক সাবান কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভা চলছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন, তাঁর হাতে একটা আস্ত সুপুরির আকারের ছোট একটা জিনিস। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছেন, 'আমাদের প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সাবানের দাম বাড়াতে পারছি না,আর সেইজন্যে সাবানের সাইজ ছোট করে আনতে হয়েছে।'

এ দুটি, এবং এরকম হাজার হাজার তুচ্ছতি-তুচ্ছ এবং সম্ভব-অসম্ভব সাময়িক বিষয়ের উপরে বছরের পর বছর কার্টুন এঁকে গেছেন, লক্ষ্মণ; রশিপুরম কে লক্ষ্মণ।

ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি অতি বিখ্যাত নাম আর কে নারায়ণ। তাঁর ভাই লক্ষ্মণ, আর কে লক্ষ্মণ। আর মানে রশিপুরম কিন্তু কে মানে কি সেটা ঠিক চট করে হাতের কাছে পেলাম না। যাকগে অতো কিছু দরকার নেই, রশিপুরম কিংবা আর কে বাহুল্য; লক্ষ্মণ নামই যথেষ্ট। এই নামেই ভারতীয় সংবাদ-কার্টুনে তিনি বিখ্যাত। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন সকালবেলা প্রভাতী সংবাদপত্রে এই ব্যঙ্গচিত্রীর কৌতুকচিত্র দেখে হাসিমুখে দিন আরম্ভ করেন।

সংবাদপত্রের শুধু সাধারণ পাঠক নয়, ভারতবর্ষের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী অসংখ্য মানুষ তাঁর রসবোধের অনুরাগী। রাজনীতিবিদরা তাঁকে সমীহ করেন, না হাসলে বোকা দেখায় তাই সরকারি কর্মকর্তারা তাঁর ব্যঙ্গ-চিত্রে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখেও যথাসাধ্য হাসেন।

লক্ষ্মণের কার্টুনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? তাঁর দেখবার ভঙ্গি, তাঁর কৌতুকী ক্যাপশন নাকি তির্যক চিন্তা। আসলে সেগুলি তো সব ব্যঙ্গচিত্রেরই খড়-মাটি-রঙ, তবে লক্ষ্মণ কেন আলাদা?

লক্ষ্মণের ছবিতে একটা সারল্য আছে, একটা ব্যঞ্জনা আছে যা সমসাময়িক এবং স্পষ্ট। বন্যাত্রাণ থেকে হরতাল, মন্ত্রিসভার পতন থেকে পরিবার পরিকল্পনা কি নেই লক্ষ্মণের সীমানায়।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে অন্তত পনের হাজার কার্টুন এঁকেছেন লক্ষ্মণ, প্রতিদিন সকালের জন্যে একটি করে, তাছাড়াও এদিকে-ওদিকে ছুটকো-ছাটকা।

লক্ষ্মণের কার্টুনে, প্রায় সব কার্টুনে রয়েছে এক সাদামাটা মানুষ। তার পরনে ধুতি আর চেক-চেক গলাবন্ধ কোট, লোকটির মাথায় বড় টাক, পাকা চুল, চোখে চশমা, নিতান্ত সাধারণ এক ব্যক্তি। কোনো কার্টুনেই তাঁর যেন কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়েও কিছু হবে না। তিনি এই বিশাল দেশের একজন সামান্য নাগরিক। সংবাদপত্রের গরিষ্ঠ-সংখ্যক পাঠক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্য-শিক্ষিত সমাজের তিনি নীরব প্রতিনিধি। সেই চেক-চেক কোট পরা লোকটি সব জায়গায় রয়েছেন, সব-কিছু স্বচক্ষে দেখছেন, কিন্তু সে নিজে কিছুর মধ্যে নেই। যে সভায় বিদ্রোহী নেতা মাইক ভেঙে বক্তৃতা করছেন সেই সভামঞ্চের পেছনেই সেই চেক-কোট পরা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। যে ঘরে বড় সাহেব টেবিলের নিচে বাঁ-হাত বাড়িয়ে ঘুষ ভেবে মাইনে নিচ্ছেন সেই ঘরের মধ্যেই সেই চরিত্র আর যেখানে চিত্রপ্রদর্শনীতে আর দশটা ছবির সঙ্গে শিল্পী একটা ক্যানভাস দেখাচ্ছেন যাতে লেখা আছে, 'স্ত্রী এবং চারটি সন্তানের

ভরণপোষণ আমার করতে হয়. সেই প্রদর্শনীতে ঠিক সমালোচকের পিছনেই নিঃশব্দে উপস্থিত এই ব্যক্তি। যাকে আমরা বলতে পারি শ্রীযুক্ত সাধারণ।

লক্ষ্মণের কার্টুন বর্ণনা করে কোনো লাভ নেই। আমার ক্ষমতা নেই আমার ভাষায় সেই কার্টুনমালার মজা বোঝানো। এই তো আমার হাতের সামনে রয়েছে উনিশশো আটষট্টি সালের একটা কার্টুন, যা ভারতীয় সমসাময়িক রাজনীতির একটি অমূল্য দর্পণ।

কার্টুনটি বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। একটি সুসজ্জিত মঞ্চ। খদ্দরের টুপি মাথায়, চাপা পাজামা, শেরোয়ানি পরা এক ব্যক্তিকে মালা পরাতে যাচ্ছেন এক অফিসার শ্রেণীর ভদ্রলোক। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফটোগ্রাফার, অন্য লোকজন এবং আমাদের শ্রীযুক্ত সাধারণ। মঞ্চের ডানদিকে ছুটে আসছেন উর্ধ্বশ্বাস, উদ্যত হস্ত এক ব্যক্তি, সাংবাদিক অথবা অফিসার, তাঁর হাতে একটা কাগজ, তিনি বলছেন, থামুন! থামুন! মালা দেবেন না! এই মাত্র আমি খবর পেলাম উনি আর মুখ্য-মন্ত্রী নেই। এই মাত্র বিপক্ষ দলের লোকেরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।'

লক্ষ্মণের কার্টুনগুলি বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। তার থেকে কিছু কিছু ছবি বেছে অনেকগুলি বই বেরিয়েছে, যেগুলির ধারাবাহিক নাম, 'তুমি বলেছিলে, তুমি এই বলেছিলে।'

একদা লক্ষ্মণ বলেছিল, আমার বর্ণনাগুলি বড়ই ক্ষণজীবী। যখনকার যা বড় খবর তার সঙ্গেই সেগুলি যুক্ত, সেই সাময়িক ঘটনার গুরুত্ব এক-দিন কমে যায়, তখন হারিয়ে যায় আমার ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনা। সংবাদ বাসি হয়ে গেলে, কোনো বিষয়ে উত্তেজনা কমে গেলে তখন আর সেই বিষয়ের উপর ব্যঙ্গচিত্র দেখে মজা পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মণের এই বিনয়ের মধ্যে সত্যতা নেই তা নয়। যে কোনো সাংবাদিক, সংবাদচিত্রী, প্রতিবেদক মনেপ্রাণে জানেন তাঁর এই সীমাবদ্ধতা সময়ের সীমায় বন্দী তাঁর তুলি বা কলম।

তবু কিছু কিছু থেকে যায়। যা ভোলা যায় না। যা ক্ষণকালের উত্তেজনাকে বহুদিনের জন্যে স্মরণীয় করে তোলে।

লক্ষ্মণের অসংখ্য তাৎক্ষণিক ছবির মধ্যে সত্যি-সত্যি রয়েছে সময়ের গণ্ডী পেরনো অনেক বঙ্কিম দর্শন। শিক্ষামন্ত্রী দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির নক্সা, স্থপতি বোঝাচ্ছেন, এ বাড়িতে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ কোনো গেট নেই, কোনো ছাত্র এর ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিংবা সেই পাশাপাশি দুটি একই রকমের সাঁকো একই খালের উপরে। একটি ইংরেজীতে, অপরটি হিন্দিতে দুটি অর্ডার এসেছে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে দুই ভাষায়, তিনিও দুটি নির্দেশই মান্য করেছেন।

আরেকটা, এক রাজনৈতিক নেতা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে লাইসেন্স পাইয়ে দেবার ব্যাপারে তদ্বির করেছেন বা অন্যদের প্রভাবিত করেছেন, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি জোর দিয়ে বলছেন যে, 'আমি নিজেই আমার ছেলেকে পারমিট দিয়েছি, অন্যকে ধরাধরি করবো কেন?'

কোলকাতা থেকে

পুজোর মধ্যে একদিন সকালবেলা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মেডিক্যাল কলেজের পিছন দিকের গেটের সামনে ফুটপাতে হাসপাতালের ভেতর থেকে একটি ছোটো পরিবার এসে দাঁড়ালো, বাস অথবা রিকশার জন্যে, তারা একটু ব্যস্ত মনে হলো। তারা মানে, দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে, তার হাত ধরে ছোট ভাই, তার বয়েস বছর চারেক হবে আর সঙ্গে মা, মায়ের কোলে কাঁথায় জড়ানো একটি শিশু।

ভিতরেই প্রসূতিসদন। নিশ্চয় সেখান থেকেই এরা এলো। বোন এবং ভাই মাকে নিতে এসেছিলো। কোনো কারণে অসুখ হয়ে বা অন্য কোনো অসুবিধের জন্যে এদের বাবা, যে এই পরিবারের কর্তা, সে আসতে পারেনি। ছোটো দিদির ওপর দায়িত্ব পড়েছে মাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসার। মায়ের বয়েসও কিছু না, সত্যপ্রসবের ক্লান্তি জড়ানো গরীব ঘরের বৌয়ের মুখ দেখে দূর থেকে যতটুকু অনুমান করা যায়, কিছুতেই তিরিশের বেশি নয়। একেবারেই গরীবের ঘর, এই পুজোর দিনে শুধু একজনের চাব বছরের ভাইটির গায়ে একটা নতুন জামা সস্তা রঙীন হাফসার্ট। কারোরই পায়েই জুতো নেই।

অনেকটা পথ হেঁটে এসে আমি উল্টোদিকে ফুটপাতের উপরে একটা বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিলাম। সকাল থেকেই ট্রামে বাসে ভিড় শুরু হয়ে গেছে। আমি আর সামান্য পথ যাবো, হেঁটেই যাবো। কিন্তু এরা, এই কচি শিশুকে নিয়ে এই দুর্বল জননী ? এই উৎসবের শহরে কোন্ খালি গাড়ি এদের জন্যে আসবে ? একটা রিকশাওয়ালার সঙ্গে কিছু

দরদাম হলো দেখলাম, কিন্তু দরে বনলো না। খালি রিকশা ঠুন্ ঠুন্ করে চলে গেল। রঙীন জামা গায়ে ছোট ছেলে চলে যাওয়া রিকশাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর কোলের শিশুটিকে বড় মেয়ের কোলে খুব সাবধানে তুলে দিয়ে, ছোটো ছেলেটির হাত ধরে মা রাস্তার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলো। একটু পরে রাস্তা পার হয়ে ঠিক আমি যেখানে বসেছিলাম, তার সামনে দিয়ে চলে গেল। শক্ত করে চার বছরের ছেলেটিকে ধরে রেখেছে একটি রুগ্ন হাত, তাতে ঢল-ঢল করছে একটি লাল পলার চুড়ি, যার গায়ে মরচে ধরা সেফটিপিন লাগানো, কাছে আসতে মুখ ভালো করে দেখা গেল না। কতকটা রোদ্দুরের জন্যেই বোধ হয় আধময়লা পুরনো শাড়ির ঘোমটায় মুখটা ঢাকা।

আস্তে আস্তে হেঁটে তারা দূরে চোখের আড়ালে চলে গেল। আমি সেই বেঞ্চিতে বসে আরেক গেলাস স্যাকারিনের আধতেতো চা খেলাম। এই এত বড় শহরে এরকম দৃশ্যের অভাব নেই, তবু পুজোর দিনে সকাল-বেলায় কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল।

অনেকদিন আগে দেখা প্রায় সম্পর্কহীন একটা ছবির কথা আমার মনে পড়লো। ত্রিশ বছর আগে হবে, তারও প্রায় পনেরো-বিশ বছর আগে-কার একটা বাঁধানো মাসিকপত্রে, বোধহয় প্রবাসীই হবে, কার আঁকা মনে নেই, একটা রঙীন ছবি। ছবিটার নাম খুব সম্ভব ছিলো গণেশ-জননী। শিশু গণেশকে কোলে নিয়ে পার্বতী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, তার টানা-টানা দুই চোখে মাতৃস্নেহের অমল অঞ্জন। মায়ের কোলে গণেশ একদৃষ্টে মায়ের মুখের দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ অকারণেই আমার অনেক কথা মনে পড়লো। কেন যেন আমার নিজের মার কথাও মনে হলো। এতক্ষণ আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে পুরনো দালানের বারান্দায় বাচ্চা নারকেল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুব দিকের রোদ ভাঙা সিঁড়ির উপর এসে পড়েছে। মা হয়তো রান্না-

ঘরে। মধ্যে মধ্যে আমার পাগল দাদা ঘরের ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাকে বিরক্ত করছে, 'খোকন যে পুজোর সময় আসবে বলেছিল ?' কিছু দূরে টাঙ্গাইল কালী বাড়িতে বারোয়ারি পুজোর ঢাক বাজছে, সকালবেলার শান্ত বাতাসে আমাদের বাড়ি থেকে সেই ঢাকের বাজনা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আমি চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের কাঠের বেঞ্চিতে বসে খুব আলগোছে কান পেতে ধরলাম, ঢাকের বাজনাটা শোনা যায় কিনা।

একদিন রাত্রে

অনেক রাত্রে এসে পৌঁছেছি, তখন দেখিনি, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই দেখলাম বারান্দায় তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছে। একটু পরে মা-বেড়ালকেও দেখতে পেলাম। দেখেই চিনতে পারলাম, বছর ছুয়েক আগে শেষবার যখন দেশের বাড়িতে এসেছিলাম, বাজারের পাশে থেকে একে কুড়িয়ে আনি। সেই বেড়ালটার এই তিনটে বাচ্চা হয়েছে।

ছুটো বাচ্চা সাদায়-কালোয় কমবেশি মেশানো, চমৎকার। সে ছুটোর মধ্যে একটার নাম দিলাম গঙ্গা-যমুনা তার গায়ে সাদার ভাগ বেশি। অন্যটার কালোই বেশি মধ্যে ছু-একটা সাদা সাদা ডোরা, তার নাম দিলাম পদ্মা-মেঘনা। বাকিটা একেবারেই কালো কুচকুচে, তার নাম-করণ হলো সোজাসুজি কৃষ্ণা। তিনটে বাচ্চারই সদ্য চোখ ফুটেছে। আমাদের পুরনো বাড়ির টানা বারান্দায় তারা লুটোপুটি হয়ে খেলা করছে।

চারদিকে ঘোর বর্ষা। মার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে আমরা

সবাই ছুটে এসেছি। আমরা অধিকাংশ সময়েই বাসার মধ্যে জলবন্দী। মায়ের আশেপাশে আর আমাদের পায়ের কাছে বেড়ালছানাগুলো খেলা করে। মাকে নিয়ে আর তাদের নিয়ে আমাদের সময় কাটে। আমাদের কাছে বাচ্চাদের নিশ্চিন্তে রেখে বেড়ালের মা এবাড়ি-ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায়, হঠাৎ কখনো এসে দুধ দিয়ে যায়। আমাদের ওখানে শেয়ালের বড়ো উৎপাত। তাই রাতের বেলায় আমরা একটা ব্যবস্থা করলাম, একটা পুরনো চালের খালি ড্রামে বাচ্চাগুলিকে ভরে দিলাম। বেরোতে পারবে না, হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে উঠোনে বা বারান্দায় চলে গিয়ে শেয়ালের পেটে যাবে না।

এর মধ্যে একদিন এক প্রতিবেশী এসে কালো বাচ্চাটাকে দেখে বাবাকে বললেন, 'কালো বেড়াল বড়ো অমঙ্গুলে, একে বিদায় করুন।' গুরুতর অসুস্থ হলেও মার জ্ঞান ছিল, মা বললেন, 'না থাকবে।' দুদিন পরে এক বিকেলে মা মারা গেলেন। মনে আছে, সেদিন শুক্লাদশমী ছিল। রাত দুটোর কিছু পরে, তখন চাঁদ ডুবে গেছে ; অন্ধকার টিপটিপ বৃষ্টি, আমরা চার ভাই আর শ্মশানবন্ধুরা ফিরে এলাম। বারান্দায় আমার স্ত্রী, পাড়া-প্রতিবেশী অনেক লোক লণ্ঠন জ্বেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, একটু দূরে আবছা অন্ধকারে এক পাশে বাবা ইজিচেয়ারে পাথরের মতো বসে রয়েছেন। আমরা পুকুরে স্নান করে এসেছিলাম, হাত-পা ধুয়ে, গায়ে-মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে অনেককাল পরে চার ভাই পাশাপাশি মেজেতে শুয়ে পড়লাম। দরজা খোলা। বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে সেই রকম বসে রয়েছেন, উঠোন থেকে মার হাতে লাগানো কলাপত্তি ফুলের ভেজা গন্ধ আসছে। বাবাকে একবার ডাকলাম, বাবা অনেকক্ষণ পরে একটু সাড়া দিয়ে চুপ করে রইলেন। এক সন্ধ্যায় সমস্ত বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। শোকে-ক্লান্তিতে আমার একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময় ছোট ভাইয়ের ডাকে চমকে উঠে বসলাম। শোয়ার সময় পায়ের কাছে লণ্ঠনটা জ্বলছিল, সেটা নেই, দরজা তেমনিই খোলা কিন্তু ইজিচেয়ার

শূন্য, বাবা সেখানে নেই।

দু ভাই ছুটে বারান্দায় গেলাম। আর দু ভাই উঠে বসলো। গিয়ে দেখি বারান্দার নিচে উঠোনে ঘাসজঙ্গলে বৃষ্টির মধ্যে এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে বাবা উবু হয়ে কি খুঁজছেন। এগিয়ে গেলাম, কাছে যেতে চোখে পড়লো একটা বেড়ালছানা, কৃষ্ণা বাবার হাতে আর বাকি দুটোকে নিচু হয়ে বাবা ধরার চেষ্টা করছেন, বার বার পালিয়ে যাচ্ছে, ধরতে পারছেন না। আমরা দু ভাই সে দুটোকে ধরে ফেললাম।

শোকের বাড়িতে কেউ খেয়াল করে বেড়ালছানাগুলোকে ড্রামে বন্দী করে রাখেনি। খোলা দরজা দিয়ে কখন তারা বেরিয়ে পড়েছে, হয়তো আরেকটু হলে শেয়ালে নিয়ে যেতো। বেড়ালছানাগুলোকে নিয়ে ভিতরের ঘরে ড্রামের মধ্যে দিয়ে দিলাম। বাবার সঙ্গে কোনো কথা হলো না, বাবা আবার নিঃশব্দে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন।

সত্যি প্রেমের গল্প

সত্যি কি আমি কখনো প্রেমে পড়েছিলাম ?

সেই যে বছর পনেরো আগে একবার ভীষণ বৃষ্টি নেমেছিলো এক সপ্তাহ ধরে। আমি তখন যেখানে থাকতাম আমাদের সেই উদ্বাস্তু উপনিবেশের এক প্রান্তে দায়সারা সরকারী বাড়িতে, তার চারদিক জলে জলময় হয়ে গিয়েছিলো। সারাদিন ধরে আমার কিছুই করার ছিলো না, কোনো বন্ধু না, তেমন কোনো বই না।

আমি চুপচাপ পশ্চিমদিকের একটা জানলার পাশে বসে থাকতাম, প্রথমত এই কারণে যে জলের ঝাপটা এই দিকে কম লাগতো, আর এই জানলার উপরে একটা সেড ছিলো বিকেলবেলার রোদ্দুর আটকানোর জন্যে যেটায় বৃষ্টির ছিটেও অনেকটা বাধা পেতো ; আসলে সেই খোলা মাঠের মধ্যে নতুন গড়ে ওঠা অঞ্চলে রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া সব কিছুরই প্রতাপ খুব বেশি ছিলো।

কিন্তু সেই প্রচণ্ড বর্ষায় শুধু বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে জানলায় বসে থাকার জন্যেই আমি পশ্চিম দিকের জানলাটা বেছে নিয়েছিলাম একথা ঠিক নয়। আর একটা কারণ ছিলো। এবং সেই কারণটাই বড়ো। ঐ জানালা দিয়ে ঐ নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির ফাঁকে কয়েকটা নতুন ওঠা কলাগাছের সবুজ কচিপাতার আড়ালে একটি মেয়েকে দেখা যেতো। কখনো ঘরের কাজ করছে, কখনো বই পড়ছে, কখনো বা জানলায় এসে দাঁড়িয়ে আমার মতোই বৃষ্টি, মেঘ বা জলস্রোত দেখছে অথবা কিছুই দেখছে না এমনিই তাকিয়ে আছে।

এই মেয়েটি আমারই পাশের বাড়ির। বহুদিন ধরে পাশাপাশি আছি,

আমারই চোখের সামনে বড় হলো, এই সেদিনও বালিকা ছিলো। এর সম্বন্ধে আমার কোনোই কৌতূহল নেই, কখনো তেমন ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি।

কিন্তু এই অবিরাম বৃষ্টিপাতের মধ্যে বন্দী, নিঃসঙ্গ এক মুহূর্তে বৃষ্টির ছিটের আড়াল থেকে, যেমন হয় আর কি, হঠাৎ মেয়েটিকে কেমন অন্য-রকম মনে হলো। জানলার পাশে চেয়ার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ওকে দেখতাম, ও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না, খুব সম্ভব করেনি।

আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অস্পষ্টতার আড়াল ছিলো। মেঘলা দিনের অঘোর অন্ধকার, বৃষ্টির ধারা ও ছেঁড়া কলাপাতার ইতস্তত পর্দা —এই সূক্ষ্ম দূরত্ব সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের সাতদিন ধরে আমাকে নিবিষ্ট করে রেখেছিলো। আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন, প্রায় প্রতি মুহূর্ত।

এ-কথা ঠিক যে সেই সময়ে আমার আর কিছুই করার ছিলো না, শুধু অলস বসে বসে বিরক্ত হওয়া ছাড়া। কিন্তু এতদিন পরে এখনো যখন কোনো কোনো দিন চারদিন ঘিরে খুব বৃষ্টি আসে, হঠাৎ সেই সাতদিনের কথা মনে পড়ে, তার প্রতি মুহূর্তে শ্যামলতার স্পর্শ লেগে আছে, কোথাও এক বিন্দু বিরক্তির তিক্ততা নেই।

একদিন বৃষ্টি অবশেষে যথারীতি থেমেছিলো। উঠোন থেকে, রাস্তা থেকে জল নেমে গেল। তারপরে রোদ উঠে রাস্তাঘাট শুকালো। আমি আবার নৈমিত্তিক জীবনে ফিরে গেলাম। সেই একই বাড়ি ঘর, উঠোন-দুয়ার; কলাগাছগুলো আরেকটু ঘন হয়েছে, আড়াল বেড়ে গেছে। কিন্তু তবু পাশাপাশি বাড়ি বলেই মেয়েটিকে আসা যাওয়া, কাজকর্মের ফাঁকে প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

কিন্তু সেই জলে ঘেরা দিনগুলিতে যে আবেশ ও মোহ রচিত, যা শুধু আমার জন্যেই, নিতান্তই আমার একার সেই অনুভব, সেই স্তব্ধ মুগ্ধতা

বোধ আর ফিরে এলো না। যাই-আসি, দেখা হয়, এই পর্যন্ত।

এখন অনেকদিন হয়ে গেছে, সেই ভাঙা বাড়ি ও তার খণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সবুজ কলাপাতার মৃদু কম্পনে আলোড়িত, বৃষ্টির জলে ঘেরা সেই সাতদিনের কথা মনে পড়লে কি রকম যেন অনুভূতি হয়, হয়তো একবার, অন্তত ঐ একবার আমি প্রেমে পড়েছিলাম।

বাসাবদল

আমার বাবা যে বাড়িতে জন্মেছিলেন, এখনো সেই বাড়িতেই বসবাস করছেন। সেই একই ভিটে, সেই একই চৌহদ্দি শুধু পুরনো আমলের বড় টিনের আটচালা আর নেই, তার জায়গায় দালান উঠেছে। সে দালানেরও বয়েস পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল; তার দরজা-জানলার কপাট কবে নড়বড়ে হয়ে গেছে, মেঝে চটে গেছে, কোথাও কোথাও পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে অনেকদিন।

তবু আজন্ম বাবা সেই বাড়িতেই আছেন। সেই বাড়িতেই তাঁর অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন, শুভবিবাহ হয়েছে। মধ্যে দু-চার বছর শুধু একবার ছাত্রজীবনে, আরেকবার এই সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতায় এসে একনাগাড়ে কিছুদিন ছিলেন।

এ রকম সকলের জীবনে হয় না। আমার নিজের জীবনেই হলো না। বলা উচিত, বিপরীত হয়েছে। প্রায় দু'যুগ আগে কলেজে ভর্তি হতে মফস্বল শহর ছেড়ে নাবালক বয়েসে কলকাতা এসেছিলাম, তারপর এই এতোদিনে কতোরকম আস্তানা বদল হলো তার হিসেব করা কঠিন।

এখন যেখানে আছি, সেখানেও আর কতোদিন থাকবো আমি নিজেই জানি না।

বাসা বদলানোর নানা ঝামেলা। নিতান্ত দায়ে না পড়লে কেউ বাসা বদলাতে চায় না। নতুন বাসা থেকে নতুন বাসায় ক্রমাগত ভাড়া বেড়ে চলে। কিন্তু অবিবাহিত জীবনে যেখানে রাজার মতো কেটে যায় সেখানেই হয়তো সংসার পাততে গিয়ে দেখা যায় অনেক অসুবিধে যা একদিন নজরেই আসেনি। তারও পরে একদিন ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে স্কুলে যায়, তাদের স্কুলের কাছাকাছি কি একটা ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না?

হয়তো পাওয়া যায়, বেশি ভাড়া দিলে, উপযুক্ত সেলামি সংগ্রহ করতে পারলে অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু স্কুল বা অফিসে যাতায়াত নয়, নাগরিক জীবনে বাসা বদলের সঙ্গে আরো অনেক সমস্যা জড়িত।

রেশন কার্ড পালটাতে হবে, পালটাতে হবে দুধের কার্ড। দরকার পড়লে ইলেকট্রিকের মিটার, গ্যাস থাকলে গ্যাসের সরবরাহকারী সব পরিবর্তন করতে হবে। ধোপা, নাপিত, খবরের কাগজওয়ালা, গোয়ালা সব নতুন করে ঠিক করতে হবে। মিটিয়ে দিতে হবে আগের লোকদের। ঠিক সময়ে রেশন কার্ড থেকে খবরের কাগজ পর্যন্ত মেটানো। এ যে কি অসম্ভব ব্যাপার—এ বিষয়ে যাঁরই সামান্য অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন।

তবুও আমরা বাড়ি বদলাই। অনেক সময় প্রয়োজনে, হয়তো কদাচিৎ এমনি এমনিই। বাসা বদলানোর একটা আলাদা ধরনের স্বাদ আছে; প্রায় বিদেশ ভ্রমণের মতো। নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে চারপাশে অচেনা প্রতিবেশী, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট একটু অন্য রকম। যে যাই বলুক নতুন বাড়ির কিছু আনন্দ আছে।

কিন্তু তার আগে খুব সাবধানে লরিতে করে কাঁচের পুরানো আলমারি নিয়ে আসতে হবে এবং এতো সাবধানতার মধ্যেও একটা কাঁচ হয়তো সত্যিই ভেঙে যাবে, হারিয়ে যাবে দু-একটা খুচরো জিনিস, অনেক

বিবেচনার পর ফেলে আসতে হবে ব্যবহার করলেও করা যেতে পারতো এমন দু-একটা সামগ্রী। তাও শেষ নয়। বাসা বদলানোর অনেক দায়। পোস্টাফিসে ঠিকানা বদল জানাতে হবে বলতে হবে নতুন ঠিকানায় সব চিঠি পত্র, পার্শেল-মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিতে। নতুন ঠিকানা আত্মীয়দের, বন্ধুবান্ধবদের জানাতে হবে।

তবু সবাই জানাবে না। দু-একটা চিঠি চিরকালই পুরনো ঠিকানায় চলে যায়, সেখানে গিয়ে চুপচাপ আরেকজনের ডাক-বাক্সে গোপনে ঢুকে পড়ে আর বেরোবার পথ পায় না। দু-একজন লোক আট-দশ বছর পরেও হঠাৎ কেন যেন পুরনো ঠিকানায় গিয়ে কড়া নাড়ে, 'অমুক বাবু বাড়ি আছেন? বর্তমান অধিবাসীরা একটু অবাক হয়, শুধু পাশের বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে বলেন, ওরা তো অনেক-দিন হলো এ পাড়া ছেড়ে চলে গেছে।

কড়া নাড়ার শব্দে হয়তো এতোদিন পরে আবার দু-একজন পুরানো পড়শির, যারা দশ বছর হলো চলে গেছে সেই তাদের কথা নতুন করে মনে পড়ে, সেই তাদের ছোটো ছেলেটি ছিলো, বারান্দায় একা একা খেলতো, সে এতোদিনে নিশ্চয় অনেক বড় হয়েছে।

একবার পুরনো বাড়ি ছেড়ে গেলে আর সেই পাড়ার সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম লোকই রক্ষা করতে পারে। যে রাস্তায় একটা টিউবওয়েল বসানোর জন্যে দশ বার দশ জায়গায় দরবারে গেছি, প্রাণান্ত করে ছেড়েছি, সেই কলের জল গত এগারো বছর খাওয়া হয়নি। মধ্যে মধ্যে সেখানকার দু-একজনের সঙ্গে রাস্তায়, ট্রামে-বাসে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, হঠাৎ কখনো একটা মৃত্যুসংবাদ, একটা বিয়ের খবর।

আর? দু-এক খণ্ড নাতিশীতোষ্ণ স্মৃতি। দরজায় বহুদিন আগের কোনো এক বালকের হিজিবিজি সই, এতোদিনে খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই কিন্তু চেষ্টা করলে পড়া যাবে না এমন নয়।

পঁচিশ বছর আগের প্রতিবেদন

এই শতাব্দী শেষ হতে তখন আর মাত্র কয়েক বছর বাকি রয়েছে, মহাকালের অরণ্যে কুড়ি নম্বর গাছটির শেষ কয়েকটি জীর্ণ পাতা তখন শীতের প্রথম বাতাসে থির থির করে কাঁপছে। নভেম্বর মাস, সন্ধ্যাবেলায় কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের নিচে বড় বাড়িটার সবচেয়ে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক ক্লান্ত ভদ্রলোক লালদীঘির রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, ঠিক আজকেই আটান্ন বছর বয়েস পূর্ণ হলো তাঁর, জীবনের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ, পঁয়ত্রিশ বছর সময় ঐ বাড়িটায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে কেটে গেল। আজ থেকে তাঁর ছুটি, অবসর।

গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভদ্রলোক শুধুই দিন গুনেছেন, একেকবার ভেবেছেন অসময়ে অবসর নিয়ে নেবেন, একেকবার ভেবেছেন লম্বা ছুটি নেবেন; দিনের পর দিন চলে গেছে অফিস-বাড়ি-অফিস। মধ্যে এক-আধদিন ছুটি রবিবার, কদাচিৎ দুটো ক্যাজুয়েল। জি-পি-ও-র গম্বুজের ছায়া ছোট হতে হতে বড় হয়েছে, আবার ছোট হয়েছে। লালদীঘির পুকুর পাড়ে কি একটা বিদেশী গাছ, এই পঁয়ত্রিশ বছরে যে গাছটার নাম জানা হলো না, সেই গাছটা চৈত্রমাসের বিকেলবেলায় গন্ধে, ফুলে, রঙে, আমার কি ভীষণ হৈচৈ করেছে বছরের পর বছর। দিন চলে গেছে, শুধু-শুধুই। কাজ, অকাজ, আরো কাজ কিছুটা দায়িত্ব, কিছুটা ঝোঁক, কিছুটা নিজের বোকামি ভদ্রলোক ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছেন ফাইলের জংলি ঝোপে, কিছুতেই কাঁটা ছিড়ে বেরিয়ে আসতে

পারেন নি, ভালো করে ছুটি নেওয়া হয়নি জীবনে। এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে জীবনের বড় বড় ব্যাপার ঘটেছে, জন্ম-মৃত্যু-পরিণয়, শিশু সাবালক হয়েছে, বাসা বদল হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে। কত প্রাণের বন্ধু রক্তের আত্মীয় চিরবিচ্ছেদের অনন্ত প্রসেশনে ভরে গেছে স্মৃতি।

ক্লান্ত ভদ্রলোক পথে নেমে একবার পরম মমতার ছেড়ে আসা বাড়িটার দিকে তাকালেন, ওর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর জীবন জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কত কি বদলিয়ে গেল, আরো কত কি কিছুতেই বদলালো না। এই তো লালদীঘি, এখন আর কজন জানে আগে এর নাম ছিলো ডালহৌসি স্কোয়ার। বি-বা-দী বাগ যখন নাম হয়, সেও প্রায় ত্রিশ বছর, ভদ্রলোকের পুরনো কথা মনে করে একটু হাসি পেলো, তিনি ধরে নিয়েছিলেন নামটা চলবে না, কিন্তু চমৎকার চলে গেল, এখন একেবারে পাকা হয়ে গেছে।

সামনে স্মৃতিচিহ্নের মতো জি-পি-ও'র গম্বুজটা এখনো আছে, কিন্তু পুরনো ঘড়িটা নেই, সে জায়গায় একটা বিদ্যুৎঘড়িতে লাল-নীল আলোয় সময়ের অঙ্ক জ্বলজ্বল করছে। দূরে টেলিফোনের নতুন বাড়িটা কবে পুরনো হয়ে গেছে, অনেক দূরে এখন নতুন টেলিফোন ভবন, এই বাড়িটা আজকাল লোকে পুরনো অফিস বলেই চেনে।

ভদ্রলোক রাস্তার এসকেলেটরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন, এখান থেকে এসকেলেটর ময়দান পর্যন্ত গিয়ে বাড়ি যাওয়ার টিউব পাওয়া যাবে, একেবারে চার লাফে লবণহ্রদ। কিন্তু বহুদিন পরে আজ তাঁর ছুটি। বহু কষ্টের ছুটি, বহু পরিশ্রমের অবসর। তিনি আজ কিছুতেই বাড়ি ফিরবেন না। বন্ধুদের একটু খুঁজতে হবে, পঁয়ত্রিশ বছর ভালো করে মেলামেশা করা হয়নি। একটু হৈ-হল্লা করতে হবে, অনেকদিন ভালো করে হৈ-হল্লা করা হয়নি। কে যে কোথায় আছে এখন? দু-একজন এত নাম করেছে যে খবর না রেখে উপায় নেই, আরো দু-একজনের খবরও কিছু কিছু রাখেন তিনি, কিন্তু বাকিরা, আর সবাই

এখন কোথায়? কেউ কেউ অবশ্য খুব দূরে একেবারে নতুন ঠিকানায় চলে গেছে। কিন্তু বাকিদের খোঁজ নিতে হবে।

একবার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সেই পুরনো চায়ের দোকানটায় যেতে হবে, একবার কফিহাউসে। দেখতে হবে জায়গাগুলো এখনো বেচেবর্তে আছে কিনা, কোনো প্রবীণ মুখ চেনা-চেনা মনে হয় কিনা। আর ধর্মতলার কাছে সেই গোলমেলে সন্ধ্যায় আড্ডাটা, সেখানেও একবার যেতে হবে, কতকাল যাই-যাই করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রলোক এসকেলেটরের মুখ ছেড়ে হাঁটাপথে লালদীঘির পুবদিকে রওনা হলেন, ওখানে একটা পান-বিড়ির দোকান আছে। কুড়ি বছর আগে সিগারেট-জর্দা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। আজ অনেকদিন পরে একটা গুণ্ডি-মোহিনী পান খাবেন, আর একটা সিগারেটও খাবেন। সিগারেটটা দোকানের ধারে নারকেল-দড়ির আগুন থেকেই ধরাবেন। এখন অফিস ছুটির সময়, তাঁর ছেড়ে আসা অফিসের ছেলেরা কেউ যদি তাঁকে এইভাবে সিগারেট ধরাতে দেখে একটু অবাক হবে বোধ হয়, তা হোক। তাতে তাঁর আর কিছু আসে যায় না। তাঁর আজ থেকে ছুটি, অনেক অনেকদিন গোলমাল করা হয়নি, হৈ-হল্লা করা হয়নি।

হলুদ পাঞ্জাবি

একটা হলুদ পাঞ্জাবি ছিলো আমার। অমন গাঢ় হলুদ রঙ কদাচিৎ চোখে পড়ে। রোদের মধ্যে বেরোলে প্রায় চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো ঘন হলুদ রঙ।

অনেকদিন আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসবে গিয়ে চারদিকে হলুদ ও গেরুয়ার ছড়াছড়ি দেখে আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিলো ঐরকম রঙের একটা পাঞ্জাবি বানানোর।

হাওড়া স্টেশন দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই এসপ্ল্যানেডের মোড়ে নেমে পড়ি। এখন যেখানে ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের স্ট্যাণ্ড তখন ওখানে একটা বড় হকার্স কর্নার ছিলো। সাধারণত কোনো দোকানে চট করে হলুদ রঙের পাঞ্জাবির কাপড় পাওয়া যাবে না। এটা আমি বুঝেছিলাম। তখনো চারপাশে অবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এতো রঙীন জামাকাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়নি। তাই বুদ্ধি করেই আমি ঐ হকার্স কর্নারে ঢুকেছিলাম কারণ ঐ বাজারে অনেক দেশোয়ালি খরিদ্দার যারা এইরকম সব গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দেয়।

খুব সহজেই পেয়ে গেলাম পাঞ্জাবির কাপড়, দামও বলতে গেলে বিশেষ কিছু নয়, পাঁচসিকে কী বড়জোর বোধহয় দেড় টাকা করে গজ পড়েছিলো। কাপড় কেনার পর ঠিক করলাম এই বাজারেই পাঞ্জাবি বানিয়ে নিই। কারণ আমি সাধারণতঃ যে দরজির কাছে জামা-কাপড় বানাই সে আমার নিজের জন্য এইরকম একটা ক্যাটকেটে রঙের পাঞ্জাবির কাপড় কিনেছি দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে তার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ ছিলো না, কিন্তু চিন্ত-

কালই এই ধরনের নানা ছোট ছোট সঙ্কোচ আমার মনের মধ্যে কাজ করে।

তিন-চারদিন পরে তৈরি পাঞ্জাবিটা হাতে পেলাম। হিন্দী খবরের কাগজের মোড়কে জড়ানো। পাঞ্জাবিটা বাসায় গিয়ে খুলে বের করা মাত্র বুঝতে পারলাম, এটা গায় দিয়ে আমার পক্ষে রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব। প্রথমে রঙটা দেখে সবটা অনুমান করা যায়নি। এখন জামা বানানোর পর বুঝলাম কী অসম্ভব একটি পোশাক তৈরি করছি।

তবু যত্ন করে পাঞ্জাবিটা বাক্সে তুলে রাখলাম। মনে মনে ঠিক করলাম সময় ও সুযোগমতো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই পাঞ্জাবিটা গায়ে দেবো।

কিন্তু সেই সময় আর সুযোগ কিছুতেই আসে না। এক বছর কেটে গেল। পরের বছর দোলের দিন চারদিকে রঙের মাখামাখি দেখে পাঞ্জাবিটার কথা মনে পড়লো। বাক্স খুলে বের করলাম। স্থির করলাম আজ বিকেলে অবশ্য-অবশ্যই এটা গায়ে দিয়ে বেরোবো। বিকেলবেলা যেন যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছি এইরকম মনোভাব নিয়ে গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ার দু-একটা কৌতূহলী দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যতোটা ভেবেছিলাম তা নয়; আমার এই বর্ণের উৎকর্ষে জনসাধারণ খুব উত্তেজিত হয়নি।

মোড়ের মাথায় দু-একজন চেনা শোনা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, তারা সমাদরে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো, 'ব্রিলিয়াণ্ট জামা হয়েছে।'

প্রথমবারের সঙ্কোচ কেটে গেল বটে, কিন্তু অস্বস্তি গেল না। যতবারই হলুদ পাঞ্জাবিটা গায়ে দেবো বলে বাক্স থেকে বের করি, গায়ে দিয়ে আবার একটু পরে ছেড়ে রেখে অন্য জামা পরে বেরোই। কিন্তু এক রবিবার দুপুরবেলায় এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ, ভাবলাম বন্ধুর বাড়িতেই যখন যাচ্ছি এটা পরেই যাওয়া যায়। নামা মাত্র বন্ধুপত্নী প্রায় আঁৎকে উঠলেন, কী সাংঘাতিক কথা! এটা কী পরেছেন? আপনাকে

তো আমরা নেমন্তন্ন করিনি, আমরা যাঁকে নেমন্তন্ন করেছিলাম আপনি বোধহয় তিনি নন। বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। একবারের জন্যেও আমাকে সমর্থন জানালেন না।

তারপর দীর্ঘকাল চলে গেছে। সেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নী আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন। পাঞ্জাবিটাও আর তৃতীয়বার গায়ে দেওয়া হয়নি। প্রায় নতুন অবস্থায় বাক্সের এক কোণায় ফেলে রেখেছিলাম।

মধ্যে আমাদের সংসারে খুব টানাটানি অনটন। সব পুরনো জামা ছিঁড়ে গেছে নতুনও বানানো হচ্ছে না। এইসময় একদিন পাঞ্জাবিটা হঠাৎ নজরে পড়লো। ভাবলাম আজকাল তো সবাই খুব রঙিন জামাকাপড় ব্যবহার করছে, আমি একটা হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে!

বের করে দেখলাম, কোথাও ছেঁড়ে-ফাটে নি, শুধু বহুদিনের অব্যবহারে কুঁচকিয়ে ময়লা হয়ে আছে। ধোপাকে কাচতে দিলাম। ফিরে এলে আর চিনতে পারি না। রঙটা খুব কাঁচা ছিলো, ব্লিচিং পাউডার দিয়ে কেচে একেবারে সাদা করে দিয়েছে।

এখন সেই পাঞ্জাবিটা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করছি। কেউ বুঝতে পারে না, তাকিয়েও দেখে না, এমন কি আমার নিজেরও একেক সময় খেয়াল থাকে না যে আমি একটা হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রয়েছি।

ঘাতকের মৃত্যু

চতুর্দিকে অমল অম্লান রৌদ্র।

কোনো অর্বাচীন কোনো বৃক্ষ রোপণ করে এই নিস্তরঙ্গ শ্যামল প্রান্তরে রৌদ্রের বিচ্ছেদ ঘটায়নি এই কথা মনে মনে ভাবতে পেরে ঠিক এই মুহূর্তেই জীবনে প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষবার অরুণ বৃক্ষবিদ্বেষী হয়ে উঠলো এবং তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্তিনী সুরমার দিকে তাকাতেই মনে হলো শ্যামপট্টবস্ত্রশোভিতা এই রমণী বৃক্ষেরই স্বরূপিণী। সুরমাকে এই রৌদ্র-করোজ্জ্বল প্রান্তরে অরুণের কেমন অসঙ্গতবোধ হলো। অরুণ সুরমাকে ঘৃণা করতে চাইলো।

এই পর্যন্ত লিখে উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে আসতে হলো। বৃষ্টির ঝাপটা আসছে। আজ কদিন ধরে অনবরত অশ্রান্ত বৃষ্টি, তীব্র জলধারা। বৃষ্টি আমার পছন্দ নয় এমন নয়, কিন্তু এই এখন যখন আমি সুরমা এবং অরুণের গল্প লিখছি, কিছুটা রৌদ্রের প্রয়োজন ছিলো। কেননা নয়ান-হাটার মাঠ, সেই বৃক্ষহীন তৃণভূমি যেখানে অরুণ এবং সুরমা এই প্রেমিক যুগলের বিচ্ছেদ ঘটেছিলো সেই নয়ানহাটার রৌদ্রোদয় আমিও দেখেছি। তাই অরুণের মুখে সমস্ত শুনেছিলাম তার এই দ্রুত বিচ্ছেদের কাহিনী আমার কেমন অর্থবহ মনে হয়েছিলো।

গমনের আনন্দ অপেক্ষা প্রত্যাগমনের দুঃখ বেশী এই সহজ সত্যটি হৃদয়ে অনুভব করে সুরমাই প্রস্তাব করেছিলো, 'চলো কয়েকদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাক। একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'কেন কলকাতা কি বিস্বাদ হয়ে গেল?' অপ্রেমিকজনোচিত এই প্রশ্নে

সুরমা বিচলিত বোধ করলো। অরুণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। না হাসলেও চলতো, কিন্তু অরুণ ভাবলো না হাসাটা এই মুহূর্তে অভদ্রতা। কিন্তু ভদ্রতার আবরণেও যেন ঢাকা গেল না অরুণের প্রবৃত্তিকে, যে প্রবৃত্তি তাকে আটকে রেখেছে। এই নগরের সহস্র ব্যস্ততায়, দ্রুত মুখরতায় তার মধ্যেও কোথাও যেন একটি ক্লান্ত, অলস মন্থরতা রয়েছে। পাকানো দড়িতে গিঁটে গিঁটে বাঁধা। অরুণ কোথাও যেতে চায় না, কোনোখানে যাওয়ার নেই।

'চলো, কাছাকাছি কোথাও থেকে ঘুরে আসি। উত্তরে দক্ষিণে যে দিকে হোক, যতটুকু দূরে হোকে, দশ বারো পনেরো মাইল, যে কয়দিন যে কয়ঘণ্টার জন্যে হোক।'

অরুণ সুরমার মুখের দিকে তাকালো। এই নারী কি বলতে চায়। এমন কি কোনো কথা আছে যা তাকে এখানে বলা যায় না এই চিরপরিচিত জনারণ্যে? এমন কি কোনো নিবেদন আছে এই রমণীর যা এখানে অর্পণযোগ্য নয়? সন্দেহ হলো, আশঙ্কাও। তাই রাজি হতে হলো। দেখি কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

ইতিমধ্যে বৃষ্টি বেশ কসে এসেছে। আমি উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিয়ে ভিজে পরদাটা খুলে নিলাম। তারপর সেটা একটু নিংড়ে ঘরের ভেতর টাঙানো দড়িতে ছড়িয়ে দিলাম। বৃষ্টি থেমে আসা আকাশ, পলাতক মেঘ অবিন্যস্ত দ্রুত গতি সব মিলে ঢাকা জানলায় বসে অরুণ এবং সুরমার ঘটনাটা আমি আরেকবার মনে করার চেষ্টা করলাম।

আমি বেশ অনেকদিন হলো ওদের দুজনকেই দেখছি। ওদের নিজেদের সম্বন্ধের মধ্যে একটা গাঢ়তা ছিলো, যা পূর্বে প্রায়শই আমার অবিচ্ছেদ্য বলে ভ্রম হয়েছে। এবং সত্যিই হয়তো অবিচ্ছেদ্য ছিলো যদি না নয়ান-হাটার মাঠে একদিন তাদের মুখোমুখি বা পাশাপাশি দাঁড়াতে না হতো।

মাত্র একদিন সময় করে একটা রবিবার মাত্র সম্বল করে অরুণ সুরমাকে

নিয়ে বেরিয়েছিলো। সকালের দিকে রওনা হয়ে যখন তারা সুরমার সেই মামার বাড়ির গ্রামের কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন বেলা সাড়ে নটা বেজে গেছে। কলকাতা থেকে খুব একটা দূর তা নয়, কিন্তু এই লাইনের বাস-গুলো এতো ধীরজ এবং আলস্যপরায়ণ, এক একটা স্টপ থেকে এতো দেরি করে ছাড়ে যে রীতিমতো বিরক্ত হতে হতে ওরা যখন নয়ানহাটা অর্থাৎ সুরমার মাতুলালয়ের গ্রামে এসে গেল তখন দুজনেই বড়ো বেশি কাহিল ; যেন বহুদিনের কোনো দীর্ঘ কঠোর যাত্রা থেকে সদ্য প্রত্যাগত, তাঁরা অনুরূপ অনুভব করছিলো।

অরুণের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে সুরমার এই মাতুলালয়ের গ্রামে আজ আর সুরমার কেউ ছিল না। সবাই অনেকদিন হলো এখান থেকে চলে গিয়েছে। সুরমার মনে বোধহয় তার কৈশোরের কিংবা শৈশবের কোনো মধুর স্মৃতি বেদনার আক্ষেপে এই ভূমিখণ্ড বিজড়িত ; তাই শুধু ঘুরতেই আসা। তা ছাড়া এখানে উন্মাদ ও বাতিকগ্রস্ত ভিন্ন কে আর বিনা কারণে আসে। কলকাতা থেকে দশ মাইল এদিক ওদিক জায়গা এই একই রকম সব জায়গা। মনে হলো বিশেষ কোনো হেরফের নেই। নয়ানহাটায় নেমে একটু মানে বাসস্টপ থেকে আধ ফার্লং ভেতরের দিকে হাঁটার পরেই অরুণ বুঝলো, ফারাকটা কোথায় ? অন্যমনস্কপ্রায় চলেছিলো হঠাৎ পেছন থেকে সাইকেলের ঘণ্টা শুনতে সরে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে সাইকেলের উপরেই পড়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে ভদ্রমহিলা দেখেই হয়তো দ্বিচক্রযানবাহক কোনো গালাগালি না করে কেটে পড়লো। কিন্তু যেতে যেতে বারবার মাথা ঘুরিয়ে সুরমার দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। সুরমা অরুণকে বললো 'লোকটা কি অসভ্য' ; অরুণের এতক্ষণ মনে মনে হাসি পাচ্ছিলো, সাইকেল চাপা পড়া বলে যে একটা ব্যাপার আছে এটা তার বিশেষ কৌতুককর বোধ হচ্ছিলো। সুতরাং সুরমার প্রশ্নের জবাবটা কাটিয়ে বললো, 'এতে কি হয়েছে। আর কত দূরে·····?' কবিতার

পুরো পংক্তিটাই অরুণের মুখে আসছিলো কিন্তু জোর করে সেটাকে চেপে গেল। অরুণের মনে মনে হাসি পাচ্ছিলো, তার মনে হচ্ছিলো যে সে যেন একটা মহৎ বোকামি করছে, কোনো জোলো প্রেমের উপন্যাসের পাতা থেকে. কোনো এক শেষাশেষি অধ্যায়ের ফাঁকে, অরুণ এবং সুরমা আমি এবং সুরমা, অরুণ ভাবছিলো') এই দুটি চরিত্র এই গ্রাম্য প্রভাতে বেড়াতে এসেছে।

তথাপি এইসব তরল চিন্তার সত্যিই আর কোনো অবকাশ ছিলো না। কেননা তৎক্ষণে আকাশ উন্মুক্ত, নীল চরাচর, কদাচিৎ পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত পথরেখা অনুসরণ করে তারা এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানেই সমস্ত সীমানা যেন টানা হয়েছে। অনাবাদী বিশাল মাঠ শীতশেষের প্রভাত নীল রৌদ্রে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর এবং পরবর্তী গ্রামচিহ্ন পীততর দেখাচ্ছিলো। নিকটবর্তী কোনো এক পুষ্করিণী অকল্যে কথার কলিচায় প্লাবিত এবং সুপ্রাচীন বিহঙ্গসঙ্কুল চিরঅজ্ঞাত কারণে সুমধুরভাষিণী।

এইখান থেকেই পথটা বাঁয়ে ঘুরে গেছে। বলতে গেলে সামনে যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, ফাঁকা মাঠ ছাড়া বাঁকটায় একটা ছোট মতো চায়ের এবং তৎসংলগ্ন একটি সিগারেটের দোকান। সেখানে সামান্য ক্রেতাসমাগম হয়েছে। দুজনে বসে অনেকক্ষণ ধরে চা খেলো। চাটা ভালো নয় কিন্তু ভালো লাগছিলো, অরুণ সমস্ত কারণে নিজেকে যেন সম্মোহিত অনুভব করছিল। ইতিমধ্যে সামনের মাঠের মাথায় ফাল্গুনের সূর্য চন্‌চন্ করে উঠে গেছে। চারদিকে খোলা মাঠে অবিসম্বাদী, অরুণের সমস্ত জীবদ্দশায় অভূতপূর্ব রৌদ্র। অরুণ এবং সুরমা দুজনেরই ইচ্ছে হলো মাঠে নেমে মাঠের মাঝামাঝি দিয়ে এই রৌদ্রে হাঁটা। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ দোকানদার তাদের সঙ্গে অনেক অপ্রাসঙ্গিক এবং অবান্তর কথা বলেছে, তাদের সম্বন্ধে গ্রাম্যসুলভ কৌতূহলে নানা প্রশ্ন করেছে। এবার দাম মিটিয়ে যখন তারা দুজনে মাঠের দিকে নামতে গেল,

লোকটা প্রশ্ন করলে, হয়তো তাদের মনোভাব বুঝতে পেরেই প্রশ্ন করলে, বাবু, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'এই মাঠের মধ্যে একটু ঘুরে আসি।'

বৃদ্ধ কেমন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে একটু তাকালো, তারপর সুরমার মুখের দিকে। তারপরে বললো, 'বাবু, ভরদুপুরে মেয়েমানুষ নিয়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে যাবেন না।'

'মেয়েমানুষ' শব্দটা খট করে অরুণের কানে বিঁধলো, সে একটু এই নিষেধে বিরক্তই হলো কিন্তু মনে মনে এই ভালো যে এদের কথা ঠিক এই রকমই অমার্জিত, কি আর করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে সুরমা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেছে।

'কেন বাঘ ভাল্লুকের ভয় আছে নাকি ?'

'বাঘ ভালুক কোথা থেকে আসবে ?' 'আমি অন্য কথা বলছি দিদিমণি মাঠটা ভালো নয়। দেখছেন না ফাঁকা মাঠ, অনাবাদী। এর পেছনে আগে যুদ্ধের সময় মিলিটারির ডেরা ছিলো ; অনেক অন্যায়, অনেক পাপ হয়েছে এই মাঠে। আমি অনেক দেখেছি আমার চোখে। এই সেদিনও রাত্রিতে একটা মানুষ খুন হয়েছে এই মাঠে। তার দুদিন আগেই একটা মেয়েমানুষের কাটা শরীরটা এই মাঠের কোনার দিকটায় ঐ ঢিপিটার কাছে কে যেন বস্তায় বেঁধে ফেলে গেছে। কোথা থেকে কারা সব আসে। মানুষকে চেনা যায় না।'

বুড়ো অত্যন্ত পরিচিত এবং অন্তরঙ্গের মতো সুরমাকে এই কথাগুলো বললো। সুরমা হঠাৎ সমনের দিকে দিকে কটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করলে, 'কি মাঠের মধ্যে নিয়ে আবার খুনটুন করবে না তো ?' বলতেই দ্বৈত অট্টহাস্যে দমকা হাওয়ায় বৃদ্ধের সমস্ত নিষেধ অমান্য করে, উড়িয়ে দিয়ে অরুণ এবং সুরমা প্রেমিকযুগল মাঠের মধ্যে নেমে পড়লো।

এখনো সামান্য ভেজা ঘাস পায়ে পায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দুজনে হাত-ধরাধরি করে মাঠের মধ্যে চলে গেল, একবার পেছন দিকে তাকিয়ে

দেখলো, বুড়োটা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে ফিরে দোকানের মধ্যে চলে গেল।

আবার ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। ফোঁটা ফোঁটা জল জানলা গলিয়ে আমার টেবিল, বইপত্র, ঘর ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমার জানলাটা আটকে দিয়ে আসতে হয়। বৃষ্টি, এই মহূর্তে বৃষ্টিতে বড় বেশি কান্ত হয়ে পড়েছি। কিঞ্চিৎ রৌদ্র আসার আজ প্রয়োজন ছিলো, ঈশ্বর, বিশেষ প্রয়োজন ছিলো।

মাঠের মধ্যে ওরা কিছুক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়ালো। বিরাট মাঠ, এত-বড় যে ঠিক কোথায় এর মাঝখানটা তা বোঝা শুধু কষ্টকরই নয়, অসম্ভব। অরুণ বহুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলো যে এই মাঠের মধ্যে সমস্ত সময় জুড়ে সুরমা অনর্গল কথা বলে গেছে। যেন এই মুক্ত প্রান্তরে এই রমণী তার সমস্ত নিরুদ্ধ বাক্যের সহজ উৎসমুখ আবিষ্কার করেছে।

সব কথা অরুণের ঠিক কানে যাচ্ছিল না অথবা সোজা কথা বলা যেতে পারে সুরমার কথার কোনো মূল্যই যেন সে আর দিতে পারছিলো না। প্রভাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত সেই বসন্ত দিনে, সমীরণে ক্ষীণ প্রকম্পিত তৃণ শ্যামল সেই নাতিশীতোষ্ণ রৌদ্রপ্লাবিত প্রান্তরে পার্শ্ব-বর্তিনী প্রেমিকাকে তার খুব সামান্যা বলে অনুভব হলো। সুরমার উপস্থিতি এই প্রান্তরে তার পাশে তাকে যেন একটু বিরক্তই করছিলো।

'কি, তুমি যে একটা কথাও বলছো না? তোমার কি হয়েছে, ভালো লাগছে না?' সুরমা অরুণের পা ঘেঁষে এসে প্রশ্ন করলো।

পায়ের নিচে ঘাসের ডগায় এতক্ষণ ধরে একটা হাল্কা রঙের প্রজাপতি ঘুর ঘুর করছিলো। অরুণ হঠাৎ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে সেটা মেরে ফেললো। মেরে ফেলে নিজেকে কেমন যেন দোষী, হত্যাকারী বলে মনে হলো। তারপর সুরমার দিকে চোখ তুললো। দেখলো সুরমা এসব কিছুই লক্ষ্য না করে দূরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সুরমা যে কিছু

দেখেনি, তাকে প্রজাপতিটা মারতে দেখেনি, এটা ভেবে অরুণ যেন একটু খুশি হলো। এবার সে সুরমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'চলো একটু বসা যাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো একেবারে ধরে গেছে।'

'কিন্তু কোথায় বসবে ?' অরুণ ক্লান্ত গলায় বললো। ঘাসে ঢাকা মাঠ, কিন্তু ঘাসের নিচের জমি সর্বত্রই অসমান, বন্ধুর। বসবার উপযুক্ত একেবারেই নয়। তবু এরই মধ্যে সমতলমতো জমি দেখে দুজনে পাশাপাশি বসলো। অরুণ দু-একটা ঘাসের শীর্ষ ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে লাগলো, সুরমাও যেন কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণ সেও নির্বাক হয়ে বসে রইলো। সহসা সুরমা একটা প্রশ্ন করলো। প্রশ্নটা শুনে অরুণ চমকে উঠলো। শুনলো সুরমা জিজ্ঞেস করছে, 'আচ্ছা, অতো সুন্দর প্রজাপতিটাকে তুমি মারলে কি করে ?' সামান্য প্রজাপতির কথা অরুণ প্রায় ভুলেই এসেছিলো। কিন্তু সুরমা সেটা লক্ষ্য করেছে এই ভেবে এতক্ষণে তার অস্বস্তিবোধ হলো।

এই প্রশ্নের পর অরুণ উঠে দাঁড়ালো। সুরমাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠলো, 'বাড়ি ফিরবে ?'

অরুণ ক্রূরতম দৃষ্টিতে সুরমার চোখের দিকে, মুখের দিকে, সমস্ত শরীরের দিকে তাকালো। চতুর্দিকে আশেপাশে জনমানব, এমন কি পশুপাখি কাছাকাছি কোনোখানে নেই। শুধু বহুদূরে আকাশে কি একটা অদৃশ্য পাখি বোধহয় শঙ্খচিলের স্তিমিত করুণ কণ্ঠ ক্ষীণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। পথপার্শ্বস্থ প্রাগুক্ত বৃদ্ধকথিত সমস্ত হত্যাকাহিনী, যা ইতিপূর্বে এই প্রান্তরে সংঘঠিত হয়েছে তার অজ্ঞাত নায়কদের সঙ্গে অরুণ যেন একাত্ম অনুভব করলো। এতক্ষণে চতুর্দিকে দূরে কাছে, তার নিজের ছায়া বাদে তার পার্শ্বস্থ এই রমণীর ছায়া ব্যতীত কোথায়ও আর কোনো ছায়া নেই, উন্মুক্ত উদ্দাম রৌদ্র। কোনো বৃক্ষ তার পল্লবিত ছায়া ফেলে এই মুক্তিকে কণ্টকিত করেনি, আলোকের বিচ্ছেদ ঘটায়নি। এইবার সুরমাকে তার একটি বৃক্ষের মতো মনে হলো। এই পল্লবিতা

তন্নু শ্যামাঙ্গিনী বৃক্ষেরই স্বরূপিণী। খণ্ডিত ছায়া ফেলে, তার ভূমি থেকে সমস্ত রস শোষণ করে স্থির আন্দোলিতা। এই নিষ্পাদপ অবাধ সীমানায় তার এতদিনের প্রেমিকাকে অরুণ ঘৃণায় হত্যা করতে চাইলো। বিশাল আকাশের নিচে সীমাহীন প্লাবিত প্রবল রৌদ্রে প্রতিটি বৃক্ষের মূলে, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করার কামনা অরুণের মনে দুর্দম হয়েছিলো। কিন্তু ততক্ষণে অন্য মনে সুরমার সঙ্গে পায়ে পায়ে অরুণ গ্রামের মধ্যে এসে গেছে। সামনের সেই চায়ের দোকানে তখন কেউ নেই। অরুণ বুঝলো সুরমা বেঁচে গেছে, সে বেঁচে গেছে। এইবার সমস্ত দিকে বৃক্ষমালা অরুণ সজ্ঞানে বুঝলো, তার সমস্ত জীবনেও বৃক্ষ-বন্ধনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও সে উৎপাটন করতে পারবে না।

কিন্তু সুরমাও হয়তো কিছু বুঝেছিলো ; সেইদিনের পর অরুণের সঙ্গে আর কোনোদিন তার আর কোনো কথা হয়নি।

অনেকদিন পরে কোনো এক প্রায়ান্ধকার বৃষ্টিমগ্ন মধ্যাহ্নবেলায় অরুণ আমাকে তার এই বিচ্ছেদের কাহিনী বলেছিলো। বহুদিন পূর্বের এক-দিনের কয়েক মুহূর্তের মূঢ়তাকে, অস্বাভাবিক চিন্তাকে স্মরণ করে, তার কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত, আমি অনুভব করেছিলাম। নয়ানহাটার মাঠের সেই প্রখর রৌদ্রোদয়ে সমস্ত হত্যার কাহিনীর যে নায়ক হতে চলেছিলো এই ক্লান্ত, বৃদ্ধ, মন্থর নগরের এক ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে এতদিন পরে তার অকৃতকার্যের জন অনুতপ্ত, লজ্জিত হওয়া ছাড়া তার কিই বা গতি আছে?

মনে পড়ে

কতো যে মনে পড়ে, মনে পড়ার শেষ নেই।

একদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আমি চুপচাপ একা একা বাড়ির বাইরে মণ্ডপের বারান্দায় বসেছিলাম। সামনের কাঁচামাটির রাস্তাটা কাদায় কাদাময় হয়ে গেছে। তবু সেই জল-বৃষ্টি-কাদায় কাজের লোক-জন রাস্তা দিয়ে দ্রুত পায়ে আসছে-যাচ্ছে। একজন লোক গেল ধুতির খুঁটটা হাত দিয়ে একটা উঁচু করে ধরে একটা পুরনো ছাতা মাথায় দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে। হাতে কিসের একটা শিশি—ওষুধের নাকি তেলের ঠিক মনে নেই, লোকটাকেও মনে নেই তাকে তার আগে কিংবা পরে আর কোনোকালে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। দেখে থাকলেও হয়তো চিনে উঠিনি কিন্তু এখন যখন কোনো কোনো দিন অঝোরে বৃষ্টি নামে, ঘর থেকে বাইরে বেরুনো হয় না জানলা দিয়ে রাস্তায় লোক বা গাড়িঘোড়ার যাতায়াত দেখি কেমন যেন হঠাৎ স্পষ্ট মনে হয় এখুনি ধুতিটা বাঁ হাত দিয়ে আলগোছে একটু উঁচু করে পুরনো ছাতা মাথায় দিয়ে একটা লোক আসবে তার হাতে যেন কিসের একটা শিশি। কখনো কখনো তেমন কোনো পথচারী হয়তো মিলেও যায় কিন্তু সেই এক যুগ আগের বর্ষণমুখরিত প্রভাতকালের অনৈক পথিকের হাঁটবার বিশেষ ভঙ্গিটি, ছাতার আড়ালের অদৃশ্য মুখটি কোনোদিন কোনো বৃষ্টিতে আর ফেরে না।

মধ্যে মধ্যে সায়াহ্নকালে আমরা শৈশবের সঙ্গীরা একটি অসামান্য প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতাম। সেই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা যতটা অসম্ভব ছিলো জয় নির্ধারণ করাও তার চেয়ে কম অসম্ভব ছিলো না।

একেকজন একেক দিক বেছে নিতাম, কেউ উত্তর, কেউ দক্ষিণ, আবার কখনো কেউ নিতাম কাছারি ঘরের বাঁয়ের দিক, কেউ ডাইনের দিক তারপর একটা করে জোনাকি গুণে যাওয়া যার দিকে জোনাকি বেশি সেই জিতবে। প্রতিযোগিতার একজন বিচারক অবশ্যই আমরা কেউ হতাম কিন্তু যেহেতু আমরা কেউই ঈশ্বর ছিলাম না, তাই সেই প্রতিযোগিতার কোনো ফল ঘোষণা সঠিক করা সম্ভব ছিলো না এবং প্রতিযোগীদের কলহই ছিল এর পরিণতি। কাছারি ঘরের সামনের মাঠ আর তার সঙ্গীরা অনেকদিন হলো সুদূর। তবু যেদিন অনেক রাত্রিতেও ঘুম আসে না-শহরের রাস্তার সমস্ত স্তিমিত জোনাকিগুলির কথা মনে পড়ে। মনে হয় আমার ময়লা মশারীর চারদিকে উত্তরে দক্ষিণে, ডাইনে বাঁয়ে অসংখ্য উজ্জ্বল প্রদীপ্ত কণিকা। তাদের গোনা যায়, কোনোদিন গোনা সম্ভব নয়। শুধু যখন ক্লান্ত অথচ বিনিদ্র, আচ্ছন্ন অথচ অস্থির তখনই রাত্রির অন্ধকার চতুর্দিকে বিস্তৃত জোনাকিমালা জ্বলছে নিভছে, অবিরাম অগুন্তি।

একদিন সকাল সকাল ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল—তখন নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। ইস্কুল থেকে বাড়ির একটা রাস্তাই শুধু চিনি—সব রাস্তা সব ঘুরপথ। তখন চিনে ওঠা হয়নি। পরপর তিনদিন ক্লাসের সব ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল, ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। অন্যান্য দিন দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। দাদার অন্য ক্লাস, দাদার তখন ছুটি হয়নি, একা একাই বাড়ির দিকে চললাম। কিন্তু দৈনিক যে পথে ফিরি সে পথে নয়; ইস্কুলের দপ্তরীর ঘরের পিছন দিয়ে একটা ছোটো রাস্তা ছিলো খালপাড়ের দিকে। সেই পথে গেলাম। বোধহয় এপ্রিল মাস। গ্রীষ্মকালের শুকনো খালের বুক সাদা ভাঁট ফুলে আগাগোড়া ছেয়ে রয়েছে; অনেকগুলো লাল মাছি গুন্‌গুন্ করছে কেমন অস্পষ্ট একটা মধুর আচ্ছন্ন গন্ধ। ভুল পথে অনেক ঘুরে ঘুরে অনেক দেরিতে চেনা সীমানায় এসে পৌঁছুলাম। কৈশোরের সেই প্রথম রোমাঞ্চিত উত্তেজিত সফর, আর সেই অভ্যাস

আমার আজও যায়নি। এখনো যখন কোনো কাজ থাকেনা আমি এই সহরের অচেনা গলিতে গলিতে ঘুরি, অচেনা বাড়ি, অচেনা রাস্তা কেমন স্পষ্ট একটা রোমাঞ্চময়তা—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে খালের নলিতে হাজার হাজার ভাঁট ফুল ফুটেছে, লাল রঙের মাছ, কবেকার ম্লান গন্ধ মনে পড়ে।

মনে পড়ে, মনে পড়ার শেষ নেই। এই কিছুক্ষণ ধরে থানার জানলার নিচে একটা বেড়াল কেন যে অকারণে কাঁদছে. কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছি এখনো বেড়ালটাকে কাঁদতে দেখেছি। বেড়াল কাঁদলেই আমার কেমন যেন কি একটা অশুভ কি যেন মনে পড়ে। ঠিক বোঝানো যায় না অস্পষ্ট কিন্তু কেমন যেন অমঙ্গলময়। অসংখ্য কথা উঠবে এটা একটা সংস্কার, এর কোনো অর্থ নেই, মানে নেই। কিন্তু মনে পড়াও তো একটা সংস্কার তার কি কোনো মানে আছে, অর্থ আছে—আর সংস্কার নিয়েই তো বেঁচে রয়েছি।

একটি চিঠি

এখনকার মারকিন পুলিস বাহিনীর একটি বিশেষ তৎপর শাখার নাম হলো নাকটিক স্কয়াড অর্থাৎ মাদক দ্রব্য প্রতিরোধী বিভাগ।

এল. এস. ডি. কিংবা ঐ জাতীয় বড়ির নেশা হিসাবে ব্যবহার, গাঁজা, চরস, আফিং ইত্যাদি কেবল ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে একালের মারকিন যুব সমাজে। মারকিন আইনে এ সবই নিষিদ্ধ কিন্তু যুবকেরা মেনে নিতে চাইছে না, তারা শহরে শহরে সংঘ-সমিতি গড়ে তুলছে পুলিস ও আইন-বিধির অন্যায় হস্তক্ষেপের (তাদের মতানুযায়ী) বিরুদ্ধে। ফলে কলকাতার রাস্তায় যেমন হকারের সঙ্গে কিংবা করডনিং পোস্টে যেমন চালওয়ালার সঙ্গে পুলিসের কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা, তেমনই মারকিন যুক্তরাজ্যে একদিকে পুলিস ধরছে, অন্যদিকে মাদকবিলাসীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এইরকম মাদকবিলাসী যারা তাদের অনেকেরই অভিযোগ এইরকম যে তারা পুলিসের হাতে নিগৃহিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মাদক সঙ্ঘে নিয়মিত অভিযোগ প্রস্তাব পাস হচ্ছে; রীতিমতো পুলিস ও আইন প্রতিরোধ সমিতি তৈরি হচ্ছে। খবরের কাগজে চিঠি লেখালেখি চলছে নিজেদের দুঃখের কথা জানিয়ে।

বাফালো শহরে অধিষ্ঠিত নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভারসিটি থেকে 'দি স্পেকট্রাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকায় কিছুদিন আগে এক ভুক্তভোগী মাদকবিলাসী একটি চিঠি দিয়েছেন, তাঁর দুঃখের কাহিনীটি একটু দীর্ঘ। আমরা এখানে সেই চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি।

'পুলিস আমার বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে এমন সব পন্থার আশ্রয় নিয়েছে যা সাধারণের কাছে হয়তো অতি অন্যায় বলে বোধ হবে কিন্তু পুলিসের কাছে স্বাভাবিক কাজ।

'পুলিস আমার ডাকের চিঠিপত্র খুলে খুলে পড়েছে, আমার টেলিফোনে মাসের পর মাস ধরে আড়ি পেতেছে এবং অবশেষে আমার ঘরে আমার যে রুমমেট থাকতো, তাকে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করেছিলো আমার সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যে।

'এইরকম বেশ কিছুদিন চললো। তারপর একদিন অ্যারেস্ট হলাম। রাত্রি তখন সাড়ে এগারোটা, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে নিজের ঘরে শুয়ে আছি। এমন সময় অত্যন্ত সুবেশ এক ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকলেন। তিনি ঘরে ঢুকবার আগে একবারও দরজায় সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবং তাঁর হাতে যদিও উদ্যত পিস্তল ছিলো তাঁর কাছে কোনো তল্লাসী পরোয়ানা ছিলো না।

'বলাবাহুল্য, তিনি নার্কটিক স্কয়াডের লোক। তিনি আমার ঘর তল্লাস করলেন এবং যা পেলেন তাহলো চারটে ট্যাবলেট,বিছানায় আমার মাথার পাশেই সেটা ছিলো এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনও ছিলো সেই সঙ্গে। আরো একটা কথা এই যে, এই ট্যাবলেটগুলি নেহাতই স্নায়ুরোগের। সেগুলিকে মাদকদ্রব্য নিরোধের আওতায় আনা অসম্ভব।

'কিছুদিন আগে আমি এক দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিলাম। তার ঘোর এবং ধাক্কা তখনো আমার কাটেনি। এই ট্যাবলেটগুলি সেই প্রয়োজনেই খাচ্ছিলাম।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। আমাকে ধরেবেঁধে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। সেখানে চললো জেরার পর জেরা, তারপর আমাকে ঠেলে দেওয়া হলো হাজতে।

'খরচ একটু বেশি হয়েছিলো, কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো যে আমি এক-জন ভালো উকিল পেয়েছিলাম, আমার জামিনদারও অনেকটা ঝুঁকি

নিয়ে সকালের দিকে হাজত থেকে আমাকে বার করতে পারলেন।

'কিন্তু আমার আসল দুর্ভাগ্যের শুরু হলো এর পরে। মামলার কল্যাণে রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে পড়লাম আমি। তাছাড়া পুলিসও তৎপর হয়ে আমার বাড়িওলাকে এবং চাকরিস্থলে আমার ওপরওলাকে জানিয়ে দিলে আমার চরিত্র ও কীর্তিকলাপের কথা। অর্থাৎ অচিরে আমাকে বাসস্থান ও চাকরি, দুইই হারাতে হলো।

এইভাবে আরো তিন মাস গেল। তখন একদিন সরকারি উকিল আমাকে ডেকে ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নেই। তাই সরকার আর মামলা চালাতে চান না। তাছাড়া যে আইনে আমাকে ধরা হয়েছিলো সে আইন নাকি আমার বেলায় খাটবে না। সেটা ফার্মেসী সংশ্লিষ্ট আইন, যা ডাক্তারখানাওয়ালাদের ওপরেই চলে।

'আবার আমি আমার কাজ ফিরে পেলাম, কিন্তু মধ্যের সময়ের মাইনে পেলাম না। একটা বাড়িও পেয়ে যাবো হয়তো এর মধ্যে। কিন্তু আমার যে ক্ষতি হলো মানসিক, আর্থিক, সামাজিক সম্মান তার ক্ষতিপূরণ কি করে হবে?

'টাকার অঙ্কে উকিলকে দিয়েছি ৩৫০ ডলার, মাইনে হারিয়েছি ১৪৫০ ডলার, বাড়ি পাল্টানো এবং দৌড়োদৌড়িতে গেছে ২০০ ডলার, মোট ২০০০ ডলার। আর আমার স্ত্রী এখনো ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে চিৎকার করে জেগে ওঠেন, এই দুঃস্বপ্নেরও শুরু হয়েছে সেই আমার অ্যারেস্ট হওয়ার হাত থেকে।'

এই চিঠির আরো অনেক দুঃখের অংশ ছিলো। সে সব থাক, অন্য দেশের আইন বা পুলিস নিয়েও আমাদের বক্তব্য কিছু না থাকাই ভালো। কিন্তু সামান্য নেশা করার অপরাধে ভদ্রলোকের ছেলের এতখানি হেনস্থা বোধ হয় না হলেই ভালো।

একটি ঘোড়ার রূপকথা

এ-গল্প অনেকদিন আগেকার, তিরিশ বছরের বেশি হয়ে গেছে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন তখনও জার্মানদের দখলে রয়েছে।

আমাদের কলকাতা শহরের যেমন ঠেলাগাড়ি, কোপেনহেগেনে ছিল সেই রকম ঘোড়ার বন্দোবস্ত, শহরের যত মালমশলা, জিনিসপত্র টানাটানি করার জন্যে ঘোড়া ব্যবহৃত হতো। কারখানা এবং গুদাম থেকে শহরের দোকানে দোকানে মাল পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো ঘোড়ার পিঠে করে। অনেক বড় কারখানাতেই বহু ঘোড়া আর সহিস রাখা হতো মালপত্র দেয়া-নেয়ার কাজের জন্যে।

কোপেনহেগেনের প্রতিষ্ঠিত একটি কোমপানি ক্রিস্টেনসেন, তাদের অনেক ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়ার নাম স্যাণ্ডি ম্যাক। বিশালকায়, কুচকুচে কালো রঙের চমৎকার ঘোড়া। তার সহিসের নাম পিটারসেন। পিটারসেন যখন কোপেনহেগেনের রাজপথে স্যাণ্ডিকে নিয়ে বেরোত, স্যাণ্ডির উজ্জ্বল কালো লোমে আলোর ঢেউ খেলে যেতো, রাজপথে নাগরিকেরা একবার না-তাকিয়ে দেখে পারতো না।

কিন্তু স্যাণ্ডির খ্যাতি তার রূপ বা চেহারার জন্যে নয়। ওরকম রূপবান ঘোড়া কোপেনহেগেনের রাস্তায় আরো অনেক ছিলো। স্যাণ্ডি বিখ্যাত হয়েছিল একবারে অন্য কারণে।

সেটা ১৯৪৪ সাল। মহাযুদ্ধের ডামাডোলে সারা ইউরোপের সঙ্গে কোপেনহেগেনও জড়িয়ে পড়েছে। একটি জার্মান সৈন্যদল কোপেন-হেগেন অবরোধ করছে, মাঝে-মধ্যে ডেনমার্কের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের

দুমদাম গুলি বিনিময় হচ্ছে রাস্তাঘাটে, গলিতে, আনাচে-কানাচে। শহর-জীবন বিপর্যস্ত, এরই মধ্যে দু-একটা দোকানপাট অফিস খুলছে, দু-একটা গাড়িঘোড়া চলছে।

এই রকম একদিন পিটারসেন কারখানা থেকে স্যাণ্ডির পিঠে মাল বসিয়ে বেরিয়েছে দোকানে পৌঁছে দিতে, হঠাৎ দখলদার জার্মান বাহিনীর সঙ্গে পথলড়াই শুরু হয়ে গেল ডেনমার্কের রক্ষী বাহিনীর, বড় রাস্তায় চৌমাথার ওপরে। তাদের তো আর নিজেদের শহর বা নিজেদের লোকজন নয়, জার্মান বাহিনী একেবারে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগলো। লোকেরা ভয় পেয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটতে লাগলো, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল। একটা দোকানের চাতালে প্রাণ হাতে নিয়ে পিটারসেন দাঁড়িয়ে ছিলো স্যাণ্ডিকে নিয়ে। স্যাণ্ডি এমনিতে শান্ত, ধীর, স্থির, মোটর গাড়ি ছাড়া পথিবীতে তার আর কোনো শত্রু আছে বলে সে মনে করে না। কিন্তু সেই স্যাণ্ডি সেদিন হঠাৎ ক্ষেপে গেল।

এবং হঠাৎ জার্মানরা দেখলো, সৈন্যসামন্ত নয়, গুলিগোলা নয়, একটা জীবন্ত কালো ঘোড়া তীব্র হ্রেষাধ্বনি করতে করতে পাগলের মতো ছুটে আসছে তাদের দিকে তীব্রতর গতিতে। জার্মানরা হতবাক হওয়ার সুযোগও পেলো না। তার আগেই একটা সামান্য পাগলা ঘোড়ার ভয়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

সেই থেকে স্যাণ্ডি ম্যাক কোপেনহেগেনের নাগরিকদের নয়নের মণি। অবরুদ্ধ, অপমানিত, পরাজিত একটি শহরের বিদ্রোহী আত্মা যেন স্যাণ্ডি ম্যাকের মধ্যে মূর্তি পেলো। রাস্তায় বাজারে, স্কুলে কাছারিতে সবাই বলাবলি করতে লাগলো একটা তেজী-কালো ঘোড়ার কথা, যে তাড়া করে জার্মানদের ভাগিয়ে দিয়েছিলো। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল স্যাণ্ডি ম্যাক।

তারপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জার্মানরা পরাজিত হয়েছে, ডেনমার্ক

তার পূর্বমর্যাদা আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছে। লোকে কিন্তু স্যাণ্ডি ম্যাককে ভোলেনি, রাস্তায় বেরোলেই স্যাণ্ডিকে আর তার সহিস পিটারসেনকে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাতো।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, স্যাণ্ডির কপালে আরো, অনেক বিখ্যাত হওয়ার কথা লেখা ছিলো।

স্যাণ্ডির তখন বয়স হয়েছে, কেমন যেন একটু ক্লান্ত, থপথপে হয়ে পড়েছে। আগের মতোই মালপত্র টানছে, কিন্তু সেই প্রাণচাঞ্চল্য কমে এসেছে। ক্রিস্টেনসেন কোম্পানির কর্মচারীরা বছরে চোদ্দদিন করে ছুটি পায়। এবার যখন স্যাণ্ডির সহিস পিটারসেন ছুটির আবেদন করলো, তখন সে একটা অসম্ভব আর্জি জানালো কোম্পানির কাছে, 'আমার সঙ্গে স্যাণ্ডিকেও চোদ্দদিনের ছুটি দিন। ও কেমন ক্লান্ত, জবুথুবু হয়ে পড়েছে। অনেকদিন তো কাজ করলো ঘোড়াটা, এবার কয়েকদিন বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসুক। জন্মানো থেকে এই শহরেই আছে বেচারা, একটু বাইরের পৃথিবীরটা দেখতে দিন ওকে।'

ঘোড়ার ছুটির প্রস্তাব এর আগে, ক্রিস্টেনসেন কোম্পানি কেন বোধহয় কোনো কোম্পানির কর্তৃপক্ষই পাননি। তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু পিটারসেন নাছোড়বান্দা। কেন স্যাণ্ডি ছুটি পাবে না? সেও তো কোম্পানির কর্মচারী, তারও তো অনেকদিনের ছুটি পাওনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কী ভেবে, সম্ভবত পাগলামি এড়ানোর জন্যই রাজি হলেন স্যাণ্ডি ও পিটারসেনকে একই সঙ্গে চোদ্দদিনের ছুটি দিতে।

বসন্তকালের এক উজ্জ্বল সকালে স্যাণ্ডি ও তার সহিস বেরিয়ে পড়লো ছুটিতে, তারা যাবে সমুদ্রতীরে। অবশ্য স্যাণ্ডি কিছু জানে না, সে জীবনে সমুদ্রও দেখেনি, গ্রামও দেখেনি। সে শুধু কোপেনহেগেন শহর চেনে। পথে যেতে যেতে পিটারসেন স্যাণ্ডিকে বোঝাতে লাগলো, শোনো, আমরা সমুদ্রের ধারে চোদ্দদিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি, কোনো গোল-

মাল করো না, একা-একা কোনো দিকে যাবে না, হারিয়ে যাবে, পথঘাট কিছু চিনতে পারবে না। সব শোনে আর স্যাণ্ডি হুঁহুঁ করে। কোপেনহেগেন শহর ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে স্যাণ্ডির যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। গাড়িঘোড়াভর্তি বড় শহরের রাস্তায় চলাফেরা করাই তার আজন্ম অভ্যাস, সে জন্মে অবধি ফাঁকা রাস্তা, ফাঁকা মাঠ দেখেনি। তার যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। একটা ফাঁকা মাঠের কাছে এসে পিটার স্যাণ্ডির লাগাম খুলে দিয়ে বললো, 'যাও, দৌড়োদৌড়ি করো। বেশি দূরে যেয়ো না যেন।'

স্যাণ্ডি যেন কেমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তার যেন পা চলছে না। তারপর হঠাৎ কী হলো, শূন্যে একটা লাফ দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তীব্র হ্রেষাধ্বনি করে স্যাণ্ডি ছুটে গেল, মাঠের মধ্যে গিয়ে পাগলের মতো চরকি পাক খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে পিটারসেন ডাকতেই স্যাণ্ডি ফিরে এলো,এসে যেন ভীষণ আনন্দ হয়েছে এইভাবে আরেকবার হ্রেষাধ্বনি করে উঠলো, এরকম আওয়াজ স্যাণ্ডির গলা থেকে আগে কখনো বেরোয়নি, স্যাণ্ডির তখন চোখ জ্বলজ্বল করছে, নাক ফুলে উঠেছে।

ধীরে ধীরে স্যাণ্ডি আর তার সহিস সমুদ্রের ধারে পৌঁছালো। পথে যা দেখে তাতেই স্যাণ্ডির প্রচণ্ড কৌতূহল। পাড়াগাঁর মাঠের ঘোড়াগুলোকে সে খুব ভালো করে দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখলো, বুঝতে পারলো ওরা তার স্বজাতি, কিন্তু মাঠে চাষ করছে বলে বোধহয় স্যাণ্ডি ওদের একটু নিকৃষ্ট বলে মনে করলো, বিশেষ পাত্তা দিলো না। সবচেয়ে কৌতূহলী হয়েছিলো স্যাণ্ডি মুরগির বাচ্চা দেখে, তুলোর বলের মতো ছোট ছোট জিনিসগুলোকে নড়াচড়া করতে দেখে তাদের শুঁকতে গেল আর তারা কিচমিচ করে পালিয়ে গেল। পুকুরধারের একটা গেঁয়ো হাঁসকে ভালোভাবে দেখতে গিয়েছিলো স্যাণ্ডি, হঠাৎ সেই হাঁসটা স্যাণ্ডির নাকে কামড়িয়ে দিয়ে উড়ে পুকুরের জলে চলে গেল, স্যাণ্ডিও ভয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে এলো।

সবচেয়ে মজা হলো সমুদ্রের ধারে। স্ন্যাণ্ডির চিরদিন বাঁধানো রাস্তায় হাঁটা অভ্যাস, বালির ওপর কিছুতেই হাঁটতে চায় না, ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগলো। আর জলে কিছুতেই নামবে না, জলে ভীষণ ভয় তার। কিন্তু পিটারসেন যখন জলে নেমে চিৎ হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে লাগলো, সে খুব চমকে উঠলো, বোধহয় ভাবলো তার প্রভু জলে ডুবে যাচ্ছে। ছুটে সে জলের মধ্যে প্রভুর কাছে যেতেই পিটারসেন হেসে উঠে দাঁড়ালো। স্ন্যাণ্ডি বুঝলো সে বোকা বনেছে, কিন্তু জলে নামার ফলে জলের মজাও সে ততোক্ষণে বুঝতে পেরেছে। এর-পর শুরু হলো তার জলের মধ্যে অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি। ঢেউয়ের মধ্যে ফেনা ছিটিয়ে খেলতে লাগলো স্ন্যাণ্ডি।

তারপর একদিন ছুটি শেষ হলো। সমুদ্রের তীরে অবকাশ কাটিয়ে স্ন্যাণ্ডি ও তার সহিস ঝকঝকে হয়ে ফিরে এলো কোপেনহেগেনে।

কিন্তু ততোদিনে সারা কোপেনহেগেন জেনে গিয়েছে স্ন্যাণ্ডির ছুটির কথা। স্ন্যাণ্ডির ছুটি উপলক্ষ করে কোপেনহেগেনের সবচেয়ে বড় রেস্টু-রেণ্ট একটা বিরাট পার্টি দিয়েছে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে সংবাদ বেরিয়েছে, 'ঘোড়ার ছুটি'। স্ন্যাণ্ডিরা যখন ফিরলো তখন পুরো কোপেনহেগেন প্রিয় ঘোড়াটিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে গেল শহরের মধ্যে। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল, সবাই ঘুরে ঘুরে দেখতে এলো স্ন্যাণ্ডিকে, এই সেই কালো ঘোড়া যে ছুটিতে গিয়েছিলো, যে অনেকদিন আগে যুদ্ধের সময় দখলদার জার্মানদের তাড়িয়ে ছিলো। সবাই বলতে লাগলো, এখন থেকে সব ঘোড়াকেই স্ন্যাণ্ডির মতো চোদ্দ দিনের ছুটি দিতে হবে, এর জন্যে আইন বানাতে হবে, ঘোড়া বলে কি মানুষ নয়!

তারপর বহুদিন হয়ে গেছে। স্ন্যাণ্ডি ম্যাক বহুদিন হলো অবসর নিয়েছে, তারপর মারা গেছে। তার সহিস সেই পিটারসেন, সেই বা এখন কোথায়। কিন্তু কোপেনহেগেন স্ন্যাণ্ডি ম্যাককে ভোলেনি, এখনো সেখানকার যে-

কোনো লোককে জিজ্ঞেস করে, ডেনমার্কের এক হাজার রূপকথার সঙ্গে আরেকটা রূপকথা যোগ হয়েছে, সে রূপকথা স্যাণ্ডি ম্যাকের।

সম্রাটের মৃত্যু

'আজ রাষ্ট্রীয় শোকদিবস। সমুদ্রতটে একটি তিমির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে সমুদ্রতীরে যেখানে সমুদ্রের সম্রাটের মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়াছে সেখানে তাঁহার শেষকৃত্য পালন করা হইবে।' এই মর্মে শোকজ্ঞাপক ঘোষণা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল।

গ্রাম-প্রধানের বিচারসভার অঙ্গনে আজ পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। কারোর মুখে একবিন্দু হাসি নেই, সর্বত্র একটা থমথমে, মৌন, গম্ভীর ভাব। বাজার বন্ধ হয়ে গেল, স্কুলের ঘণ্টা বাজলো না। দূর-দূরান্তরে অরণ্য প্রদেশের গহন গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ দূতমুখে এবং লোকপরম্পরায় এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল।

মিসিবী ঘানা অঞ্চলের সমুদ্রতটবর্তী এক প্রত্যন্ত প্রাচীন শহর। আগের দিন রাত্রিতে যেমন বৃষ্টি হয়েছে, সেইরকম ঝড়। সারারাত ধরে শুধু সমুদ্রের উদ্দাম গর্জন শোনা গেছে. এক আদিম অশান্ত আক্রোশে যে জেলেরা মাছ ধরতে তাদের ডিঙিগুলি নিয়ে বেরিয়েছিলো তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসতে পেরেছে কেউই জীবনে এই ঝড়-জলের স্মৃতি ভুলে যেতে পারবে না। তাদের ডিঙি নৌকোগুলো জলের ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আজ সকালে কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার। এমন ঝকঝকে রোদ উঠেছে যে মনেই হয় না কাল রাত্রে অমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন হয়ে এসেছিলো।

জেলেরা সমুদ্র তীরে অনুসন্ধানে ব্যস্ত। অনুসন্ধানের বস্তুর সংখ্যা অনেক ; নিরুদ্দেশ সঙ্গীদের তারা খুঁজছে, সংগ্রহ করছে তাদের ডিঙি নৌকোর ভাঙা টুকরোগুলো আর ছেঁড়া জালের যেটুকু অংশ পাওয়া যায়। এই খুঁজতে খুঁজতেই তাদের নাকে হঠাৎ একটা কটু অচেনা গন্ধ এসে লাগলো। আঙুল দিয়ে নাক চেপে ধরে তারা একটু ইতস্ততঃ লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলো কি একটা বিশাল বস্তু প্রায় তীরের কাছাকাছি অল্প জলে আটকে রয়েছে, সেটাকে ঘিরে রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোটো সামুদ্রিক মাছ আর পচা দুর্গন্ধটা আসছে ঐ বস্তুটা থেকেই।

যারা সমুদ্রতীরে অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলো তাদের অধিকাংশেরই এই বস্তুটা যে কি সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতাই নেই কিন্তু বহু পুরুষের লোকশ্রুতি এবং পিতামহ-পিতামহীর কাছে শুনে শুনে তাদের ব্যাপারটা অনুমান করতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না। চিরদিন সমুদ্র তীরে তাদের বসবাস, সমুদ্রের সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের রক্তের সম্পর্ক। যুদ্ধে, অনাচারে, দুর্ভিক্ষে সমুদ্রই তাদের প্রার্থনা জ্ঞাপনের দেবতা। সেই দেবতার রাজ্যের সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে। একটি তিমির মৃতদেহ সমুদ্র সৈকতে ভেসে এসেছে।

প্রথম কর্তব্য হলো যথাদ্রুত অঞ্চলপ্রধানের কাছে এই শোকবার্তা পৌছে দেওয়া। তীরভূমি থেকে তখনই কয়েকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হলো অঞ্চল-প্রধানের এজলাসে। এজলাসে সংবাদ পৌছনো মাত্র একজন কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে গেল ঘটনার সত্যতা নিরুপণের জন্য। কারণ এ তো কোনো সাধারণ নৈমিত্তিক ঘটনা নয়, এ ঘটনা বহুকালে এক-আধবার ঘটে। অতল সমুদ্রে কতো তিমি মাছই হয়তো মারা যায়, কিন্তু যখন একটা মৃতদেহও তীরে এসে পৌছয়, তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পুরো রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য অবশ্যই পালনীয়।

অঞ্চলপ্রধান ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ামাত্র এজলাসে সমস্ত

কাজ সেদিনের মতো স্থগিত হয়ে গেল। ঢোল নিয়ে সংবাদবাহকেরা চতুর্দিকে এই শোকসংবাদ প্রচার করতে বেরিয়ে গেল। বাজারের ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতা, খামারের কর্মরত কৃষক যে যেখানে ছিল সবাই হাতের কাজ ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়লো মৌন শোকযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে।

অঞ্চলপ্রধান গম্ভীর শোকার্ত মুখে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন মাথা নিচু করে পারিষদেরা। এখনো বাজারে, রাস্তায় ঢ্যাঁড়াদারেরা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে যাচ্ছে। দূর দূরান্তর থেকে যারা ব্যবসা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে বাজারে, দরবারে এসেছিলো তারাও সমস্ত কাজ বন্ধ করে দরবারের বাইরে চত্বরে এসে জমায়েত হলো। সেখানে সরকারী ঘোষক মন্দ্র-বিষাদ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'আজ রাষ্ট্রীয় শোক দিবস…', তারপর তিনি মিসিবীর অধিবাসীদের সঙ্গে সমুদ্রের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথোপযুক্ত ভাষায় বললেন এবং বর্তমানে তাদের কি কর্তব্য সেটাও জানালেন।

বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। বেলা প্রায় দুপুর। ভিড় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। যতদূরে এই সংবাদ যাচ্ছে, লোকজন ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসছে। আজ এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং ঘটেছে যার কথা এতোকাল তারা শুধু শুনেছে আজ স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হবে। শুধু দু-একজন গ্রামবৃদ্ধ অর্ধ শতাব্দী কিংবা তারও আগেকার অনুরূপ ঘটনা স্মরণ করে পরস্পর আলোচনায় ব্যস্ত, আর তাদের ঘিরে রীতিমতো ভিড়।

অঞ্চলপ্রধানের নির্দেশে এবং মনোনয়নে অবিলম্বে একটি শোক পালন কমিটি গঠিত হয়ে গেল। প্রাচীনদের কাছ থেকে এ নিয়ে প্রয়োজনীয় বিধি এবং নির্দিষ্ট প্রথা বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হলো। তারপর আরম্ভ হলো শেষকৃত্যের আয়োজন।

তীরের যে অঞ্চলে তিমির মৃতদেহটি পাওয়া গেছে তার আশেপাশের চারদিকের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফেলা হলো। বাঁশ কেটে ছোটো

আকারের অনেক ঘর বানানো হলো জায়গাটা ঘিরে। নিয়ে আসা হলো পিপে ভর্তি মদ, নারকেল আর তালরসের তাড়ি।

বেলা দুটো নাগাদ সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য। কামান দাগা চলতে লাগলো, আর ঘনঘন বেজে চললো শিঙা। সপারিষদ অঞ্চলপ্রধান লাল রঙের পোশাক পরে চলে এলেন। সকলেরই পরনে রক্ত রঙের পোশাক, মেয়েদের কাপড় লাল খোয়াই মাটি দিয়ে রাঙানো, মাথার চুলে লাল রঙের রুমাল ফিতের মতো করে বাঁধা।

বিরাট শোকযাত্রা সমস্ত অঞ্চল প্রদক্ষিণ করে আবার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এলো, ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে এসেছে। মিছিলের লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। সমস্ত শোক মিছিল এসে যখন তীরে সমবেত হলো অঞ্চলপ্রধানের সহকারী সবাইকে মৌন, অচঞ্চল হয়ে বসে পড়তে অনু-রোধ করলেন। এবার অঞ্চলপ্রধান উঠে দাঁড়িয়ে এক পাত্র মদ আকাশের দিকে তুলে ধরে ধীরে-ধীরে মাটিতে ঢেলে ফেললেন তারপর শোকগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

'আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের বন্ধনে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে আবদ্ধ। আর এই তিমি সমুদ্রের সম্রাট ; জলরাজ্যের অধিপতি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং অঞ্চলের অধিবাসীদের তরফ থেকে, হে সম্রাট, তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তোমার মহান মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। কি ভাবে আজ তোমার মৃত্যু হয়েছে তা আমরা জানি না। হয়তো তোমারই কোনো সহচর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি বীরের মতো নিহত হয়েছো, হয়তো যারা তোমার মৃত্যুতে আনন্দ লাভ করে তাদেরই কারো নিষ্ঠুরতায় তোমার জীবনান্ত হয়েছে কিংবা হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে তোমার। সে যাই হোক, তোমার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয় বিয়োগব্যথা অনুভব করছি, অনুভব করছি অসামান্য ক্ষতি হলো আমাদের।

আজ তোমার এই মৃত্যুলগ্নে আমরা আবার তোমার কাছে আমাদের

ঐতিহ্যের ঋণ স্বীকার করছি ; প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার বংশধর, পরবর্তী পুরুষদের সঙ্গে আগামী দিনে একই মহৎ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবো। আমাদের দুর্ভাবনায়, দুর্গত দিনগুলিতে আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা জানাবো বংশ পরম্পরায়, আমরা প্রার্থনা করবো আমাদের এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি, মহামারী থেকে উদ্ধার। আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের সম্পদ সব কিছুর জন্যে, হে সম্রাট, তোমার উপরেই নির্ভর করে যাবো।

'তোমার শান্তি হোক।'

শেষকৃত্য শুরু হলো। মেয়েরা তিমির ব্রতকথা শুরু করে দিলো। বহু শতাব্দীর সব প্রাচীন কাহিনী রূপক লোকগাথা। মিসিবী দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে তিমি মাছের কতো কালের সম্পর্ক, কতো জন্ম মৃত্যু প্রণয় অনুরাগ, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের বহু পুরাতন কথা আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মৃত বর্তমান তিমিটির কাল্পনিক প্রশংসামালা রচনা করে চললো মেয়েরা।

অঞ্চলপ্রধান নিজে তদারক করতে লাগলেন। সমবেত জনতাকে সমানভাবে পানীয় পরিবেশন করা হলো। যারা দূরাগত তাদের জন্যে আহারের আয়োজন করা হলো। তারপরে শোক গাথা, সমবেত সঙ্গীত। যুবক-যুবতীরা ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগলো অতীত দিনের গান। শিকারীরা বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, বোমা ফাটিয়ে, বাজি পুড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো মৃত সম্রাটকে। জেলেরা জলে নেমে গেল মাছ ধরতে, কৃষকেরা লাঙল এনে সমুদ্রতীরে ভূমিকর্ষণ করতে লাগলো, পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। সকলেই কিছু না কিছু করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

শেষকৃত্যের কাজ যতো এগিয়ে যেতে লাগলো, চতুর্দিকে কান্নার করুণ ধ্বনি ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মহিলামহলে যেন প্রতিযোগিতা পড়ে গেল শোক উচ্ছ্বাসের।

ক্রমশ সমুদ্রের আকাশ থেকে সিন্ধু শকুনেরা ঝাঁক বেঁধে নেমে আসতে লাগলো, তারা মৃত তিমিটির চারপাশে ঘিরে উড়তে লাগলো, দু-একটি দুঃসাহসী পাখি তিমির শরীরে নেমেও পড়লো।

আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। পরপারে নীল দিগন্তরেখার রক্তাভ সূর্য অস্ত গেল। চারিদিকে গভীর মৌনতা। শোককারীরা মৃত সম্রাটের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নুড়িই হোক বা শঙ্খই হোক একটা কিছু তটভূমি থেকে কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কি সব গুঞ্জন করলো, তারপরে সেই বস্তুটা নিজের নিজের মাথার চারপাশে একটা পাক দিয়ে ঘুরিয়ে তিমির শরীরের দিকে ছুঁড়ে দিলো; এরপর আর একবারও তিমিটার দিকে ফিরে তাকানো যাবে না, যথাকৃত্য সম্পাদন হলো।

আগামীকাল সকালে মৃত সম্রাটের চিহ্নাবশেষও হয়তো থাকবে না। সিন্ধু শকুনেরা যদি কিছু ফেলে যায় হাড় গোড়, কঙ্কাল, সেটুকুও সমুদ্রের স্রোতের ঢেউয়ে বিলীন হয়ে যাবে।

আফ্রিকা বনাম আমেরিকা

আমাদের পরিচিত পণপ্রথার বিপরীত একটি প্রথা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে প্রচলিত আছে। বরপণ না দিয়ে বিয়েতে কন্যাপক্ষই পাত্রপক্ষের কাছ থেকে কনেপণ আদায় করে।

যখন কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে লেখাপড়া বা চাকরির জন্যে দেশের বাইরে যায়, বিদেশীদের বহু অজস্র প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকেই, সেটি হলো কনেপণ নিয়ে।

নিজেদের সামাজিক প্রথা নিয়ে এই জাতের প্রশ্ন অনেকেই অধিকাংশ সময় সহজভাবে নিতে পারে না, নেয়া সম্ভবও নয়। একটি কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে তাঁর মারকিন বন্ধু এই নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি সাফ জবাব দেন যে, 'হ্যাঁ, আমরা দাম দিয়ে বৌ কিনি, তাই বৌ আর বিয়ে ব্যাপারটা আমাদের কাছে দামী, তোমাদের মতো সস্তা খেলো হয়ে যায়নি।'

এছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি কনেপণ প্রথার সমর্থনে কিছু যুক্তিও এগিয়ে দিতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই টাকাটা আমরা মেয়ের বাবাকে দিই নববধূর সাজ-পোশাক, বিয়ের খরচ ইত্যাদির জন্যে। এটা এক ধরনের ন্যায্য সামাজিক ট্যাক্স এবং আয়কর, বিক্রয়কর ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতিসম্মত শুল্ক প্রথার চেয়ে এই কনেশুল্ক কোনো অর্থেই খারাপ বা নিন্দনীয় নয়। তাছাড়া এই পণপ্রথা আমাদের দাম্পত্য ভালবাসার সম্পর্ককে কোনো কারণেই নষ্ট করে না। আমরা আমাদের বিবাহিত স্ত্রীকে কখনোই হস্তান্তরযোগ্য বা অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করি না, যেমন মনে করে থাকেন, অনেক তথাকথিত সভ্য শ্বেত মানুষেরা।'

নাইজেরিয়ার এই কৃষ্ণাঙ্গ যুবকটি, এর নাম ব্যাবস ফ্যাফুনওয়া (ঐ নামের ইংরেজি বানান হলো Babs Fafunwa) অতঃপর মারকিনী এবং পাশ্চাত্ত্যে সম্পর্কের তীব্র তিক্ত, সমালোচনা করেছেন। তথাকথিত সভ্য সমাজে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীরা যে কুৎসিত, নোংরা ব্যবহার করে থাকে, তার চেয়ে বড় গ্লানি, ব্যাবস ফ্যাফুনওয়ারের মতে, আধুনিক সভ্যতার আর কিছুই নয়। যে কোনো আফ্রিকান স্বামী অনেক বেশি গভীরভাবে ভালবাসে তার স্ত্রীকে ইউরোপীয় বা মারকিন স্বামীর তুলনায়।

একজন আফ্রিকান ইচ্ছে করলে একাধিক বিয়ে করতে পারে। কিন্তু ডাইভোর্সে সেখানে নেই বললেই চলে। সে জায়গায় একজন আমেরিকান একসঙ্গে একটির বেশি বিয়ে করতে পারে না, কিন্তু ডাইভোর্সের মামলার আর অন্ত নেই।

ব্যাবস ফ্যাফুনওয়া একটি মজার অভিযোগও এনেছেন, সেটি মারকিনী রমণীদের বিরুদ্ধে। যে কোনো মারকিন মেয়ে নাকি প্রেমের ব্যাপারে আফ্রিকান মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি হিংসুটে এবং ঈর্ষাকাতর।

শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত ফ্যাফুনওয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আমেরিকা আসলে মেয়েদের স্বর্গভূমি। 'লেডিস ফার্স্ট' থেকে শুরু করে 'উওম্যানস্ প্রিভিলেজ্' আগাগোড়া সামাজিক জীবন জুড়ে মেয়েদের অত্যধিক প্রশ্রয় ও পাত্তা দেওয়া হচ্ছে। এমনকি অভিভাবকেরা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পড়াশুনা করাতে বেশি পক্ষপাতী।

দেশের দেওয়ানী এবং উত্তরাধিকার আইনও সেই রকম। এই আইনের কোনো মাথামুণ্ডুই নেই ব্যাবস ফ্যাফুনওয়ার কাছে। সাবালক ছেলে জীবিত থাকলেও আমেরিকার যখন কেউ মারা যায়, সে তার সমস্ত সম্পত্তি ছেলেকে বঞ্চিত করে স্ত্রীকে দিয়ে যায়। উত্তরাধিকার নষ্ট হওয়ার ফলে পারিবারিক বনিয়াদ ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। প্রত্যেক সংসারই এক পুরুষে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ছে। মা বেঁচে নেই বলে কোথাও

কোনো ছেলে যদি বাপের সম্পত্তি পায়ও, দেখা যায় যে, সেই উত্তরাধিকারীর বোনেরাও ভাগীদার এবং কখনো কখনো ছেলের চেয়ে মেয়েরাই বেশিটুকু পায়।
এ সবই আফ্রিকান সমাজের একেবার বিপরীত ব্যাপার এবং শ্রীযুক্ত ফ্যাফুনওয়া এ সবেরই অতি বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

খুনী গোয়েন্দা খুনী

কলকাতার যেমন লালবাজার,লণ্ডনের যেমন স্কটল্যাণ্ড, প্যারিস পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের তেমনই সুরেট।
এই সুরেটে গোয়েন্দা দপ্তরের কনিষ্ঠতম অফিসার ছিলেন লেডরু। অত্যন্ত অল্প বয়সে লেডরু সরকারি সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন। লোকে বলাবলি করতো, লেডরুর মতো ডিটেকটিভ হয় না, পায়ের ছাপ দেখেই মানুষের চেহারাটা কেমন বলে দিতে পারে, সিগারেটের ছাই শুঁকে বলে দিতে পারে সিগারেটটা কোন্ ব্র্যাণ্ডের।
কিন্তু আসলে লেডরু তেমন চৌকস ছিলেন না এবং এ কথাটা লেডরু নিজেই সবচেয়ে ভালো করে জানতেন। তাঁর সফলতার প্রধান উৎস ছিলো তাঁর ধৈর্য এবং কষ্টসহিষ্ণুতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়ে, ঘুম বিশ্রাম সব ফেলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যের সন্ধানে লেগে থাকা লেডরুর স্বভাব ছিলো। অকুস্থলে গিয়ে প্রতিটি আলপিন, প্রতিটি ছেঁড়া সুতো যা কিছু নজরে আসে ইঞ্চি ইঞ্চি করে পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজতেন। নিহত ব্যক্তির পঞ্চাশ গজ দূরে কুড়িয়ে পাওয়া একটি ভাঙা বোতামের মালিককে লেডরু দিন-রাত্রির পরিশ্রমে খুঁজে বার করতেন। সেই ভাঙা বোতামটি হয়তো অন্য গোয়েন্দার ক্ষেত্রে

নজরে পড়তোই না। অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অনমনীয় ধৈর্য নিয়ে লেডরু যে তদন্ত চালাতেন তার কয়েকটিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন তিনি।

কিন্তু কখনো লেডরু তাঁর ওপরওলাদের জানতেও দিতেন না যে রহস্য ভেদ করতে তাঁকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁদের সব আজগুবি রিপোর্ট দিতেন, তার সঙ্গে ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। পাঁচ ঘণ্টা ধরে একজন সন্দেহভাজনকে অনুসরণ করে পরে গ্রেপ্তার করেছিলেন লেডরু, কিন্তু রিপোর্ট দিলেন যে ঘটনাস্থলেই পৌঁছে তিনি বুঝতে পেরে যান এই লোকটিই খুনী। এই রকম সব বানানো খবরের ভেতর থেকে এ কথা বোঝা অসম্ভব ছিলো যে লেডরু কোনো তদন্তের পিছনে অনাহারে, অনিদ্রায় একনাগাড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা লেগে থেকেছেন অথবা এক সপ্তাহে তিন ঘণ্টার বেশি বিশ্রাম পাননি। বস্তুত কর্মজীবনে প্রায় সব সময় বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমে সাফল্য অর্জন করেছেন লেডরু, যেটা তাঁর কর্তৃপক্ষকে তিনি কখনোই জানতে দেননি। তাহলে তাঁকে তাঁরা ধীর অথবা নির্বোধ ভাবতে পারেন, এই ভয় ছিলো লেডরুর।

লেডরু তখন ছুটিতে। সমুদ্রের ধারে এক ছোট শহরে বেড়াতে গেছেন। এমন সময় সেখানে এক খুন হলো, খুবই রহস্যময় সেই ঘটনা। এক তরুণ ব্যবসায়ী সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রতীরের এক হোটেল থেকে সমুদ্রস্নান করতে বেরিয়েছিলেন, রাত্রে আর ফেরেননি। পরদিন সকালবেলা এক রুটিওয়ালা সমুদ্রের ধারে বালির উপরে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পায়, সেই মৃতদেহের মাথার খুলিতে গুলির গর্ত।

স্থানীয় পুলিস কোনো কিনারা করতে পারলো না সেই হত্যারহস্যের। খবর গেল সর্বোচ্চ গোয়েন্দা দপ্তরে, প্যারিসের স্যুরেটে। স্যুরেটের সবাই জানে যে লেডরু তখন ঐ জায়গারই কাছাকাছি ছুটি কাটাচ্ছেন, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠানো হলো এই তদন্তের ভার নেওয়ার জন্যে। ছুটিতে বেড়াতে এসেও লেডরুর অব্যাহতি নেই।

তদন্ত করতে শুরু করে লেডরু মহা গোলকধাঁধায় পড়ে গেলেন। নিহত ব্যক্তির পকেটের টাকা খুনী স্পর্শ করেনি, তাঁর কোনো শত্রু ছিলো বলে দেখা যাচ্ছে না, তাঁর মৃত্যুতে লাভবান হতে পারে এমন লোক মাত্র একজন—তিনি হলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু সেই স্ত্রীও সেই খুনের রাত্রিতে নিঃসন্দেহে হোটেলের ভিতরেই ছিলেন। তা হলে? পুরো ঘটনাটি এতই রহস্যাবৃত যে লেডরু বহু পরিশ্রমেও কূল করতে পারেন না।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র লেডরু নন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, সারাদিন ধরে হত্যার স্থলের পাশে ছুঁচ খোঁজার মতো করে খুঁজেছেন কিছু সূত্র মেলে কিনা। কিছুই মেলেনি। অন্ধকার হতে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এসে আবার বালি ঘাঁটতে লাগলেন। হঠাৎ মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিলো সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে, একটা পায়ের ছাপ দেখে থমকে দাঁড়ালেন লেডরু। বাঁ পায়ের ছাপ, একটু স্বতন্ত্র ধরনের, পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে একটা অংশ একেবারে ফাঁকা, স্পষ্টতই ওখানে কোনো বিকৃতি আছে। লণ্ঠনের আলোয় অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন রবার্ট লেডরু, তারপর খুব যত্ন করে প্লাস্টার দিয়ে ছাপ তুলে নিলেন।

পরের দিনই সকালবেলায় সেই সমুদ্রতীরের ছোট শহরের থানায় প্রবেশ করলেন প্যারিস সুরেটের বিখ্যাত তরুণ গোয়েন্দা রবার্ট লেডরু। ঢুকে উত্তাপহীন কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, এই হত্যা মামলার আমি সমাধান করেছি। এই দেখুন হত্যাকারীর পায়ের ছাপ, বাঁ পা। 'প্লাস্টারের ছাপটি এগিয়ে দিয়ে লেডরু দেখালেন, 'এই দেখুন বুড়ো আঙুলের ঠিক নিচে কতটা ফাঁকা, মাংসই নেই', বলতে বলতে নিজের বাঁ পায়ের জুতো মোজা জুতো খুলে ফেললেন তরুণ গোয়েন্দা, তারপর পা উঁচু করে থানার লোকদের দেখালেন, 'দেখুন শুধু এই পায়েই এই রকম পায়ের ছাপ হতে পারে। আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করুন। আমিই হত্যাকারী।'

রবার্ট লেডরুকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হলো। অনেক তদন্ত করে

বোঝা গেল লেডরু এক ধরনের মানসিক রোগী ; রাতের বেলায় সে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, বিনা স্বার্থে বিনা প্রয়োজনে মানুষ খুন করতে পারে। অথচ দিনের বেলায় তাঁর কোনো বিকৃতিই নেই। তখন তিনি যে কোনো সাধারণ মানুষের মতোই সুস্থ ও স্বাভাবিক। তাঁর যা কিছু মানসিক বিকৃতি রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে ; লেডরুর উকিল আদালতে এই বিষয়টির প্রতি জোর দিয়ে বললেন, 'ঘুমন্ত লোকের কাজের জন্য জাগ্রত লোকের কেন ফাঁসী হবে ?'

লেডরুর ফাঁসী হয়নি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিলো, শুধু রাত্রিবেলার জন্য। প্রতিদিন সকালবেলা জেল থেকে বেরিয়ে যেতেন লেডরু, সন্ধ্যা-বেলায় ফিরে গারদে ঢুকতেন। দীর্ঘ একান্ন বছর ধরে এই রকম চলেছিলো। উনিশশো উনচল্লিশ সালের এক রাত্রিতে জেলখানার ভিতরে লেডরু মারা যাওয়ার পর চূড়ান্ত খালাস পেলেন।

দাও ফিরে সে অরণ্য

কিছুদিন আগে ডেভিড্ লেফার্থি নামে এক ইংরেজ যুবক এক গুহায় প্রবেশ করেছিল থাকবার জন্যে, পর্বতগুহায় নির্জনতম প্রদেশে দিন-রাত্রির কোনো ব্যবধান নেই, এক বিন্দু আলোকরশ্মিও প্রবেশ করতে পারে না। সময় সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা বা রাত্রি সবই আলোকনির্ভর। সকালবেলা চা না খেলে আমাদের মাথা ধরে, দুপুরে স্নান না করলে বিশ্রী লাগে, সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুবান্ধবের মুখ না দেখলে মনে হয় সারা দিনটাই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই যে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা এ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চেতনাই যদি বরবাদ হয়ে যায় তা হলে কি আর মাথা ধরবে ? বিশ্রী লাগবে ?

রাতের ঘুম, দিনের উত্তেজনা, হৈ-চৈ-কোলাহল সব কিছু থেকে যদি আমরা সেই সেই গুহার নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করি তবে আমাদের মানসিক অবস্থা কি হবে ? আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের শারীরিক প্রয়োজনগুলি সেই সময়হীন আলোই পরিমণ্ডলে কি রূপ ধারণ করবে ডেভিড্ লেফার্থি তারই অনুসন্ধানে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। ইংলণ্ডের মেণ্ডিন হিলের এক গুহায় একশো ত্রিশ দিন বাস করে এলেন তিনি।

এদিকে ফরাসী দেশের এক তরুণ রেস্টুরেন্ট মালিক জঁা নিয়ের মেইরতে ইতিমধ্যে আরেকটি গুহার অন্ধকারে প্রবেশ করেছেন। তাঁর পরিকল্পনা ছ'মাস থাকার। ছ'মাস বসবাস করে মঁসিয়ে মেইরতে মিস্টার লেফার্থির চারমাস দশদিনের রেকর্ড ভাঙবেন বলে আশা করেছেন। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা সেই প্রতি-যোগিতা এখন গুহাবাসের সঙ্গতায় এসে পৌঁছেছে।

যা হোক মঁসিয়ে মেইরতে ছ'মাস গুহার অন্ধকারে কাটাবেন স্থির করে ঢুকেছেন গুহায়। তাঁকে এখন এক বছরও গুহায় রেখে দেওয়া যায়। কারণ এই আগস্টের চার তারিখে তাঁর গুহাবাসের চৌষট্টি দিন পূর্ণ হলো, কিন্তু সেই তারিখে তাঁর সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে তাঁর ধারণা তিনি মাত্র আটত্রিশ দিন হলো গুহায় প্রবেশ করেছেন। এই ধারণার কারণ অবশ্যই ঐ আলোকহীনতা। দিন-রাত্রি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই এখন আর মঁসিয়ে মেইরতের নেই।

ফরাসী দেশের নাইস অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম দিকের এক পর্বতগুহার অভ্যন্তরে ভূপৃষ্ঠ থেকে দুশো ফুট নিচে মঁসিয়ে জঁ্যা পিয়ের মেইরতে পহেলা জুন তারিখে প্রবেশ করেছেন; ঠিক আছে যদি অন্য রকম খারাপ ভালো কিছু না ঘটে তবে তিনি এই পহেলা ডিসেম্বরে ছ'মাস পূর্ণ হলে বেরিয়ে আসবেন।

গুহার অভ্যন্তরে রয়েছেন একাকী মঁসিয়ে মেইরতে কিন্তু বাইরে ছ'-জনের একটা টিম নানা ভাবে এবং নানা উপায়ে সদাসর্বদা তাঁকে পর্য-বেক্ষণ করে চলেছে। মানুষের উপরে একাকীত্ব, নির্জনতা এবং অন্ধকারের প্রভাব কিরকম সেই বিষয়ে গুরুতর গবেষণা চলেছে।

এই গবেষণার উদ্যোগী কিন্তু কোনো খেয়ালী পরিষদ বা পাগলা বৈজ্ঞানিক সভা নয় ফরাসী সরকারের খোদ্ ডিফেন্স মিনিস্ট্রির তত্ত্বাবধানে এই গবেষণা চলেছে। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার কি প্রয়োজনে এই ধরনের গবেষণা সহায়তা করতে পারে তা অনুমান করা খুব কিছু কঠিন হয়তো নয়। এমন যদি কোনো দিন আসে যেদিন পারমাণবিক বা হাইড্রোজেন বা তার চেয়েও বিধ্বংসী কোনো মারণাস্ত্রে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেদিন যদি সম্ভব হয় তা হলে মানুষকে এই পৃথিবীর অভ্যন্তরেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আশ্রয় নিতে হবে।

আলোকহীন, সময়হীন, পৃথিবীর অন্ধকার অভ্যন্তরে মানুষ কি ভাবে থাকতে পারবে মঁসিয়ে মেইরতের অর্ধবৎসর গুহাবাস হয়তো তারই

দিক নির্দেশ করবে।

মঁসিয়ে মাইকেল সিফরে নামীয় এক তরুণ ভূতত্ত্ববিদ, তাঁর বয়েসও মাত্র সাতাশ বছর, এই গুহাবাসের পরিকল্পনায় তাঁরই অবদান সব চেয়ে বেশি। তিনিই ধরতে গেলে এর আয়োজন করেছেন ফরাসী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মঁসিয়ে মেইরতের খোঁজ নিয়ে তাঁকে গুহায় নামতে উৎসাহ দেয়।

মঁসিয়ে মেইরতে যখন জেগে থাকতেন তখন তো নানা উপায়ে তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনুসন্ধান করা হচ্ছে, ঘুমের মধ্যেও মঁসিয়ে মেইরতের রেহাই নেই। তাঁর চোখের পাতা এবং চিবুকের সঙ্গে ইলেকট্রোড লাগিয়ে অনবরত তাঁর পেশী সঞ্চালন ব্যবস্থার কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না, স্বপ্নের মধ্যে সেই অন্ধকার গুহায় তাঁর শরীরে কি কি ঘটছে—প্রতি মাসে পাঁচনাম তার অর্থাৎ মিনিটে গড়ে প্রায় একবার রিডিং নেওয়া হচ্ছে।

এ সবই বিজ্ঞানের দিক, গবেষণার দিক, যন্ত্রজটিলতা ও অঙ্কের হিসেব। কিন্তু এই তরুণ, আমুদে রেস্টুরেণ্ট মালিকটি যে হঠাৎ তাঁর সঙ্গী-সঙ্গিনী, তাঁর শখের চায়ের দোকান, বিকেলের মজলিস, রাতের মজা ফেলে বিজন অন্ধকারে, অসীম একাকীত্বে নিজেকে নির্বাসন দিলো ছ'মাসের জন্যে তাঁর মনের মধ্যে কি ঘটলো।

ছ'মাস অন্ধকার বাসের পরে আবার যখন দিনের আলোয় শহরের রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে, হট্টগোলের মধ্যে এসে দাঁড়াবেন মঁসিয়ে মেইরতে কি রকম বোধ করবেন? এখনই বা কি রকম বোধ করছেন তিনি?

মাত্র দুশো ফুট উর্ধ্বে যে পৃথিবী, সেই আলোছায়াময়, হাসিকান্নায় মেশা যে জগৎ, তাঁর পরিচিত পরিবেশ, পরিজন ও প্রিয়জন তাঁদের কথাই বা এখন তাঁর কি ভাবে মনে পড়ছে!

পুরাকালের সন্ন্যাসীরা এই ভাবেই গুহার নির্জনে মোক্ষের সন্ধানে জীবন কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁরা তো সংসারবিবাগী, গৃহত্যাগী। তাঁদের কথা

আলাদা।

ইংরেজ যুবক মিস্টার ডেভিড্ লেফার্থি অথবা ফরাসী তরুণ মঁসিয়ে জঁ্যা পিয়ের মেইরত্তে এরা নিশ্চয়ই কেউ সাধু বা সন্ন্যাসী নন, বৈরাগীও নন।

এঁরা হয়তো নিজেদের মনে মনে অন্ধকার ও নির্জনতার, সময় ও একাকীত্বের নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন, যে অর্থ বিজ্ঞানীর গবেষণায় অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রয়োজনের কোনো কাজেই লাগবে না, শুধু ছুটি মানুষ নিজেদের মনে মনে জেনে রাখবেন কতো যুগ আগের তাঁদের আদিমতম গুহাবাসী প্রপিতামহ অন্ধকার নির্জনতায় অরণ্যে ও গুহায় জীবনের স্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই স্বাদ হয় তো এখনকার নগরবাসের মতো এতো লবণাক্ত, এতো তিক্ত মনে হবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নয় ; মিঃ লেফার্থি ও মঁসিয়ে মেইরতের একটি যৌথ তুলনামূলক বিবৃতি বেরোলে ভালো হয়, মানবসভ্যতা একবার ভেবে দেখতে পারবে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর' এই প্রস্তাবে সায় দেওয়া যায় কি না।

যাদুকর

অধ্যাপক মদনমোহন সরকার এই পাহাড়ী শহরে সস্ত্রীক এসেছেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে। এসে উঠেছেন ভক্তভারণ পাণ্ডের হিল লাইফ হোটেলে।

মদনমোহন ভেবেছিলো গরমের ছুটিতে স্ত্রীকে নিয়ে মধুচন্দ্রিকায় বেরোবে। কিন্তু যখন সে দেখলো অপর্ণা তাসখেলায় একেবারেই আনাড়ি, বাধ্য হয়েই তখন সে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ধরে এপ্রিল মাসেই বিশেষ ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিলো। তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মধুচন্দ্রিকা যাপনের নিরিবিলি অবসরে অপর্ণাকে তাসখেলা শেখানো।

কিন্তু একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, যার নতুন বিয়ে হয়েছে, যে স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে বেরিয়েছে এবং যে এই বয়স অব্দি তাসখেলাকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি, তাকে তাসখেলা শেখানো কি অসম্ভব সেটা মদনমোহন ক্রমশ বুঝতে পারছিলো।

নববিবাহের প্রথম প্রণয়রসে সিঞ্চিতা অপর্ণার এখন স্বামীর সঙ্গে ছলা-কলার দিকে ঝোঁক। সে কেন তাসখেলা শিখতে যাবে ?

ফলত এই পাহাড়ী শহরের ছোট হোটেলের দোতলার ঘরটি মান-অভি-মানে, অনুরাগ-কলহে ভরে উঠেছে। মদনমোহন তার বিয়ের পাওয়া দু প্যাকেট প্ল্যাস্টিকের তাস ছড়িয়ে বসেছে। সেই ফুলশয্যার রাত থেকে রাতদিন চেষ্টা চলছে ; হরতন ইস্কাবন, চিড়িতন আর রুহিতনের জালে অপর্ণা একেক সময় হাঁফিয়ে উঠছে।

আরেকটা অসুবিধা হয়েছে এই যে মদনমোহন বিরক্ত বোধ করলেই বলে, 'ধুত্তোরি ছাই।' আর এই কথাটা শুনলেই অপর্ণার ভীষণ হাসি

পায়। সেই ছোটবেলায় অপর্ণাদের মফস্বল শহরের বাড়ির উল্টোদিকে একটা নিমগাছের ডালে বসে একটা পাগল সারা সকাল দাঁতন করতো আর কাছাকাছি লোকজন দেখলেই 'ধুত্তোরি ছাই' করে উঠতো। সেই থেকে অপর্ণার এক রোগ এই কথাটা শুনলে হাসি কিছুতে সামলাতে পারে না।

এদিকে মদনমোহন রায় অধ্যাপকসুলভ কায়দায় তাসশিক্ষার একটা রুটিন করে নিয়েছে। যেমন সকালে তাসের সংখ্যা ও রঙ; দুপুরে বিভিন্ন তাসের বিভিন্ন ব্যবহার, বিকালে তাস খেলা কয় প্রকার ইত্যাদি।

এই মাত্র মদনমোহন সাহেব বড় না বিবি বড়—এইটা বোঝাচ্ছিলো অপর্ণাকে। কিন্তু অপর্ণার তখন নজর পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে পুবের একটা ফিকে সবুজ রঙের বাচ্চা পাহাড়ের দিকে। মদনমোহন যখন টেক্কা-সাহেব-বিবির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতায় ব্যস্ত, তখন আসলে অপর্ণা কিছুই শুনছে না মদনমোহন যেই জিজ্ঞাসা করলো, 'শুনলে?' অপর্ণা পাশ কাটিয়ে অনুরোধ করলো, 'চলো না, ঐ ছোট পাহাড়টায় একটু ঘুরে আসি।'

এরকম এই প্রথম নয়, আরো এক হাজার একবার হয়েছে। হতাশ, ক্লান্ত মদনমোহন রাগে দুঃখে প্লাস্টিকের তাসগুলি যা এতক্ষণ বিছানার উপরে ছড়ানো ছিলো, তুলে নিয়ে সোজা খোলা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিলো

পাঁড়েজি অর্থাৎ হিল লাইফ হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে এই সময় বাজার করে ফিরছিলেন। তাঁরই চোখের সামনে পাখির পালকের মতো তাসগুলি ছড়িয়ে ছাইগাদার উপরে এসে পড়লো।

একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অপর্ণা। ভীষণ গম্ভীর ও থমথমে মুখ তার। কিন্তু পাঁড়েজির নজরে সেটা পড়লো না। তিনি দেখলেন, মেয়েটি ধীর স্থির পায়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঐ নোংরা ছাইগাদা থেকে সবকটি তাস কুড়িয়ে নিলো। তিনি স্পষ্টই লক্ষ্য করলেন

যে, মেয়েটির চালচলনে একটি যাত্রকরী মহিমা আছে। তিনি আরো অভিভূত হয়ে পড়লেন যখন দেখলেন যে, অপর্ণা তাসগুলি টিউবওয়েলে ধুতে নিয়ে গেল।

এর আগে পাঁড়েজি প্লাস্টিকের তাস দেখেননি। তাঁর অতিবড় কল্পনাতেও এমন কিছু নেই যেখানে তাসের প্যাকেট জল দিয়ে ধোয়ামোছা করা যায়।

স্যুটকেশে প্রফেসার এবং সরকার দেখে মদন দম্পতি সম্পর্কে ম্যাজিসিয়ান বলে প্রথমে তার মনে যে ধারণা হয়েছিলো, জানলা দিয়ে তাস উড়ে পড়া এবং তারপরে এই জল দিয়ে তাস ধোয়া দেখে এবার সেটা বদ্ধমূল হলো।

তার উপরে এই কিছুদিন হলো একটু দূরের জংশন শহরে একজন যাত্বকর খেলা দেখাচ্ছেন। পাঁড়েজির হোটেলের একজন খদ্দের বলেছিলো, তিনি নাকি এই শহরেও আসছেন। পাঁড়েজির তখন সেটা বিশ্বাস হয়নি। আজ পঁচিশ বছর তিনি এইখানে হোটেলে ম্যানেজারি করছেন। এই জংলি শহরে যাত্রা এসেছে, সার্কাস এসেছে, থিয়েটার পুতুলনাচ পর্যন্ত এসেছে কিন্তু ম্যাজিক কখনো আসেনি। পাঁড়েজি ম্যাজিকের সত্যিমিথ্যে হাজার হাজার গল্প আশৈশব শুনে এসেছেন, কিন্তু কখনোই ভালো ম্যাজিক দেখেননি।

মদন-দম্পতির হাবভাব, চালচলন দেখে তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বপ্ন এতোদিনে সফল হতে চলেছে। এঁরাই ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন। কিন্তু এই বোকা শহরের লোকগুলোর যা ছিরিছন্দ, ম্যাজিসিয়ান শেষপর্যন্ত ম্যাজিক দেখাবে কি? এই প্রশ্নের খোঁচায় পাঁড়েজি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু উত্তর পাওয়া কি এতোই সোজা!

॥ ২ ॥

'হিল লাইফ' হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তাঁর অনুমানে কখনো ভুল হয় না।

'হিল লাইফ' নাম শুনেই যাঁরা ভজতারণবাবুকে এবং কোন্ শহরের কোন্ হোটেলের কথা এখানে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তাদের প্রথমেই বিনীতভাবে জানাতে চাই যে, বাংলা বিহারের সীমানায় যে পাহাড়ী এলাকায় আধাশহরগুলোর খুব স্বাস্থ্যকর বলে নাম আছে, তাদের প্রত্যেকটিতে একটি করে 'হিল লাইফ' নামে হোটেল আছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ম্যানেজারের নাম ভজতারণ পাণ্ডে।

এই এলাকায় আধাশহরগুলোর স্বাস্থ্যকর খ্যাতি কবে, কি করে রটেছিলো কিংবা কে বা কারা কি স্বার্থবশে এই মিথ্যা রটনা করেছিলো তা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। গ্রীষ্মকালে যেমন ভয়ঙ্কর গরম পড়ে বর্ষাকালে তেমনই বৃষ্টি, কাদা, মশা, সাপ। আর শীতে দারুণ ঠাণ্ডা, কেউ কখনো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রিতে গোপনে বরফ পড়ে এ বিষয়ে যাঁরাই শীতে এই অঞ্চলে কখনো না কখনো বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।

এইরকম একটি স্বাস্থ্যকর শহরে 'হিল লাইফ' নামীয় হোটেলের ম্যানেজার ভজতারণ পাণ্ডে, যাঁকে অনেকেই পাঁড়েজি বলে সম্বোধন করে, তিনি একদিন সকালে বাজার করে হোটেলে ঢোকার পথে দেখলেন যে তাঁরই হোটেলের দোতলার ঘরের জানলা থেকে এক গুচ্ছ তাস হাওয়ায় উড়ে এসে হোটেলের রান্নাঘরের সামনে ছাইগাদায় ছড়িয়ে পড়লো।

হোটেলের ঐ ঘরটিতে একজোড়া যুবক-যুবতী, দেখে মনে হয় নবদম্পতি আজ কদিন হলো এসে উঠেছে। কি করে যেন কি কি লক্ষণ দেখে পাঁড়েজির ধারণা হয়েছে যে, এঁরা হয়তো কোনো ম্যাজিসিয়ান দম্পতি। প্রথমেই পাঁড়েজির সন্দেহ হয়েছিলো এদের কালো স্যুটকেশটি দেখে। কালো চামড়ার স্যুটকেশের ওপর গোটা গোটা হরফে ইংরেজিতে লেখা প্রোফ Prof এম. এম. সরকার এবং তারপরে বাংলায় লেখা প্রফেসার মদনমোহন সরকার।

প্রথমত প্রফেসার, তার উপরে সরকার। পাঁড়েজির বিপুল অভিজ্ঞতায়

এমন কোনো যাতুকর কোথাও দেখেননি যে প্রফেসার নয় এবং সরকার নয়। তার উপরে এইমাত্র যে দোতলার জানলা দিয়ে তাসবৃষ্টি হচ্ছিলো সেও নিশ্চয়ই কোনো যাতুর খেলারই অংশ।

পাঁড়েজি এইসব ভাবছেন এমন সময় দোতলার ঘর থেকে যুবতীটি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলো। বাজারের থলে হাতে পাঁড়েজি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এরপরে যা ঘটলো সেটা বলার আগে সামান্য কিছুদিন আগের কথা একটু বলে নেয়া ভালো।

সামান্য কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত মদনমোহন সরকারের বিয়ে হয়েছে। একটু আগে দোতলার ঘর থেকে যে মেয়েটি বেরুলো তার নাম অপর্ণা। অপর্ণা মদনমোহনের সদ্যপরিণীতা পত্নী। মদনমোহনের বয়স নিতান্ত আটাশ। তার পেশা অধ্যাপনা, কলকাতার শহরতলীর একটি কলেজের বিজ্ঞানবিভাগে সে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। যে কালো স্যুটকেশটির উপরে প্রফেসর এম. এম. সরকার লেখা, সেটি সে অন্যান্য দ্রব্য ও অপর্ণাসহ সদ্যবিবাহ করে অর্জন করেছে। শ্বশুরালয় থেকে জামাতার নামের পূর্বে পদমর্যাদা যোগ করে দেওয়ায় মদনমোহন কতোটা খুশি হয়েছে বলা কঠিন। তবে মদনমোহন সম্পর্কে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। মদনমোহন পৃথিবীর সমস্ত লোককে তুই ভাগে ভাগ করে দেখে। এক, যারা তাস খেলে আর তুই, যারা তাস খেলে না। অর্থাৎ মদনমোহন অতীব তাসাসক্ত। তার বন্ধুরা তার বিয়েতে তু প্যাকেট প্লাস্টিকের তাস উপহার দিয়েছে।

তুঃখের বিষয়, বিয়ের আগে অপর্ণা তাসের তো অক্ষরও জানতো না। শিক্ষা শুরু হলো ফুলশয্যার রাত্রিতেই। ফুলশয্যার রাতে নবদম্পতির প্রথম বাক্যালাপ এইরকম হয়েছিলো :

মদনমোহন (অপর্ণার হাত ধরে)—'বসো।'

অপর্ণা (নিচু গলায়) –'এই বসেছি।'

মদনমোহন—'তুমি তাস খেলতে জানো ?'
অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'
মদনমোহন (একটু হতাশ কণ্ঠে)—'তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো।'
অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'আচ্ছা।'
এরপরে একটু চুপচাপ। মদনমোহন একটু কেশে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার আমাকে ভালো লাগছে ?'
অপর্ণা সলজ্জ হেসে বললো, 'হ্যাঁ।'
কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার মদনমোহনের প্রশ্ন, 'এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে জানো ?'
অপর্ণা (ঘাড় নেড়ে)—'না।'
মদনমোহন বললো, 'বাহান্নটা।'
অপর্ণা চুপ। মদনমোহন বললো, 'মনে থাকবে তো বাহান্নটা ?'
তারপর বললো, 'বাপের বাড়ি ছেড়ে এসে তোমার মন কেমন করছে না ?' অপর্ণা ধরাগলায় কি বললো ঠিক বোঝা গেল না।
একটু পরে আবার মদনমোহনের গলা শোনা গেল, 'বলো তো এক প্যাকেটে কটা তাস থাকে ?'

॥ ৩ ॥

অতঃপর মদনমোহন এবং অপর্ণার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। এমনিতেই তো তাসখেলা শিখতে গিয়ে বিপুল নাজেহাল হয়ে পড়েছে অপর্ণা। তার উপরে এই যাদুকরী সন্দেহ। মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে এসে এমন বিপদে বোধহয় আর কোনো নবদম্পতি কখনো পড়েনি।
পাঁড়েজি এবং তার হোটেলের বোর্ডারদের মধ্যে প্রথমে ফিসফাস করে আলোচনা শুরু হলো এই যাদুকর দম্পতি নিয়ে। তাঁরা মদন ও অপর্ণার সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যেই ম্যাজিকের ছোঁয়া দেখতে পেলেন। তাঁদের আলোচনা অতি দ্রুত ছিল লাইফ হোটেলের সীমানা ছাড়িয়ে এই ছোট শহরের বাজারে, রাস্তায়, অফিসে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্রমাগত কৌতূহলী জনতার ভিড়ে হিল লাইফ হোটেল ছেয়ে রইলো। মদন-দম্পতির রাস্তায় বেরিয়েও রেহাই নেই। সর্বদাই পশ্চাতে, প্রায় পনেরো ফুটের নিরাপদ ব্যবধানে, অন্ততঃ সাত-আটজন লোক। সব সময়েই চাপা গলায় তাদের দিকে আংগুল দেখিয়ে সবাই কি সব আলোচনা করছে।

মদনমোহন অথবা অপর্ণা কেউই প্রথমে ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি ঘটনাটা কি? প্রথমে হোটেলে ভিড় দেখে তারা দুজনেই ভেবেছিলো যে হোটেলে বোধহয় কোনো রাজনৈতিক নেতা বা চিত্রতারকা বা ঐ জাতীয় অভিজনপ্রিয় কেউ আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু যখন জনতা মদনমোহনেব পিছে-পিছেই ঘুরতে লাগলো, তার ভয় হলো যে এবা কি তাকে অন্য কিছু ভেবে ভুল করছে। চিত্রতারকা? কিন্তু শহরতলীর কলেজের পদার্থবিদ্যাব নিরীহ অধ্যাপক সে, তার চেহারার মধ্যে কোথাও চিত্রতারকাব কোনো ব্যাপার নেই। তবে, সব নবীন স্বামীর মতোই তাব মনে হলো যে তার স্ত্রী অপর্ণা একেবারে যাকে বলে চিত্রতারকার মতো দেখতে। সবাই হয়তো তাই ভুল করছে। কিন্তু মদনমোহন অপর্ণাকে ঘরে রেখে নিজে একা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো তথাপি এক দঙ্গল ভিড় তাকে অনুসরণ করছে।

এইবার তার রীতিমতো ভয় হলো। এরা তাকে কোনো ফৌজদারি মামলার পলাতক আসামী বলে ধরে নেয়নি তো। রাস্তায় পাশের পানের দোকানে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য একটা দশ টাকার নোট দিতে সেই দোকানী এত বেশি উল্টেপাল্টে নোটটা দেখতে লাগলো যে মদনমোহনের রীতিমতো সন্দেহ লাগলো যে এরা বোধহয় তাকে কোনো কুখ্যাত জালিয়াত বলে ভুল করেছে। দোকানী অনেকক্ষণ দেখেশুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নোটটা ভাঙিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আর খুচরো ফেরত দিলো। আর যেই সে দোকান ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি সেই একদঙ্গল লোক দোকানের উপর হুমড়িয়ে

পড়ে তার দেয়া নোটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

হোটেলে ফিরেও স্বস্তি নেই। হোটেলের সমস্ত বোর্ডার, ঠাকুর-চাকর এবং সবচেয়ে বেশি করে ম্যানেজার পাঁড়েজি তাকে দেখে কিরকম অর্থময় হাসি হাসে।

তাস খেলা শেখানো মাথায় উঠেছে। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচে। রাস্তায় বেরোলে পিছনে পিছনে ভিড়, চারদিকে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ। হোটেলের ভিতরেও তাই। ময়দানে মিটিং করে ফুলশয্যা যাপন করার মতোই অসম্ভব এই রকম অবস্থায় মধুচন্দ্রিকা উপভোগ করা। তার উপরে দুশ্চিন্তা; এরা কি ভাবছে, এরা কেন অনুসরণ করছে? কি এদের এত কৌতূহলের কারণ?

ঘরের দরজাও খুলে রাখার উপায় নেই। কেউ না কেউ ছাদে যাওয়ার ছলে একবার উঁকি দিয়ে দেখে যাবে তারা কি করছে। ভালো আপদ হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে অন্ধকারে উদ্বিগ্ন মুখে নবদম্পতি মুখোমুখি বসে—কি করা যায়? দুজনে মিলে ঠিক হলো আগামী কাল সন্ধ্যাতেই ফিরে যাবে। আর নয়। তবে গরমের ছুটিতে আরেকবার মধুচন্দ্রিকায় বেরোতে হবে, এবার একেবারেই জমলো না। সেই সময়েই অপর্ণা একেবারে পুরোপুরি শিখে নেবে তাস খেলাটা।

দুজনে মিলে এই রকম আলোচনা করতে করতে মনের মধ্যের উদ্বিগ্ন ভাবটা একটু কমে এসেছে। জানলা দিয়ে দূরের ফিকে সবুজ রঙের বাচ্চা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে অপর্ণা দেখলো সেটা এই সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে কেমন ফিকে নীলচে হয়ে এসেছে। অপর্ণা মদনমোহনের হাত ধরে টান দিয়ে বললো, 'চলো ঐ পাহাড়টায় একটু যাই। এখন এই অন্ধকারে কে আর আমাদের দেখবে বা পিছু নেবে?' মদন-মোহনের একটু সংশয় ছিলো যদিও, কিন্তু কোনো আপত্তি ছিলো না। ঘরের মধ্যে আরো দম আটকে আসছিলো।

দুজনে মিলে উঠে বেরোতে যাচ্ছে। এমন সময় তারা দরজা খুলবার

আগেই বন্ধ দরজায় কড়াটা কে যেন একটু খুটখুট করে নাড়লো। মদনমোদহন দরজা খুলে দিতেই দেখে পাঁড়েজি। পাঁড়েজি একই রকম অর্থময় হাসি হেসে বললেন, 'প্রফেসার সরকার, আপনাদের সঙ্গে এখানকার দারোগাবাবু একটু আলাপ করতে এসেছেন।'

দারোগাবাবুর আলাপ করতে আসা শুনে মদনমোহন বুঝতে পারলো এবার তাকে বিনাদোষে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য জেলে যেতে হচ্ছে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

দারোগার নাম শুনে মদনমোহনের প্রাণে যতোটা ভয় হয়েছিলো দারোগাকে দেখে কিন্তু ভয় একটু কাটলো। এই গরমেও গলায় সিল্কের মাফলার জড়ানো, প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা জুলপি, চিকন প্রজাপতি সিরিঞ্জের গোঁফ, তার কয়েকটা লোম সদ্য পেকেছে, চোখে-মুখে আমুদে চেহারা এই লোকটিকে দারোগার পোশাকে যেন বড় বেমানান মনে হচ্ছে।

মদনমোহনের ভরসা হলো যে সে চেষ্টা করলেই এই দারোগাবাবুকে বোঝাতে পারবে যে সে আসলে নিরীহ অধ্যাপক; কোনো ফৌজদারী মামলার পলাতক আসামী বা জালিয়াত অথবা ঐ জাতীয় কিছু নয়।

কিন্তু দারোগার কথা শুনে তার মন আবার সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। দারোগা মদনমোহনকে উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্য অভিনন্দন জানিয়ে বললো, 'আসুন আসুন। আপনার কথা এতোই শুনছি যে আপনাকে না দেখে থাকতে পারলাম না। একেবারে থানার সমস্ত কাজ ফেলে রেখে চলে এলাম।'

এরই সঙ্গে পাঁড়েজি যোগ দিলেন, 'আপনার সব কথাই আমি ওকে বলেছি।'

কি বলেছে পাঁড়েজি, কে জানে? মদনমোহন ভয়ঙ্কর ঘামতে লাগলো। দারোগাবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'আপনার মতো গুণী লোক আমা-

দের এই অজ শহরে যে পদধূলি দেবেন এ আমরা আশাই করতে পারি না।'

কথাগুলো কেমন ব্যঙ্গের মতো শোনাতে লাগলো মদনমোহনের কানে। এরকম স্তুতিবাক্য শোনা তার বিশেষ অভ্যাস নেই। সে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো ; হাতজোড় করে বললো, 'পাঁড়েজি বা দারোগাবাবু, আপনারা কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সকাল-সন্ধ্যা আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ঘিরে এত ভিড় কিসের ?'

দারোগাবাবু কিছু বলার আগেই হাত কচলাতে কচলাতে পাঁড়েজি উত্তর দিলেন, 'আপনার মতো এতোবড় ম্যাজিসিয়ান আমাদের এখানে এসেছেন। তা লোকজনের একটু উৎসাহ হবে না ? তারা আপনাকে দেখতে চাইলে আপনি কি না করতে পারেন ?'

মদনমোহন বিস্মিত, বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, 'ম্যাজিসিয়ান' তার মানে ?'

দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে আপনি। দারোগাগিরি করছি আমি বারো বছর। আমার কাছে আর গোপন করবেন না প্রফেসর সরকার।'

বহু চেষ্টা করলো মদনমোহন, সেই চেষ্টায় সতী-সাধ্বী অপর্ণাও যোগ দিলো, কিন্তু এদের মন থেকে কিছুতেই, সে বা তারা যে মোটেই ম্যাজি-সিয়ান নয়, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারলো না।

এই রকম বিপদে মানুষে পড়ে ! এর চেয়ে জালিয়াত হয়ে জেলে গেলে কখনো না কখনো খালাস পাওয়া যেতো। কিন্তু এদের হাত থেকে খালাস নেই। শহরের সমস্ত লোক দাবি জানিয়েছে যে প্রফেসর সরকারকে এই শহরে অন্ততঃ একবারের জন্যও ম্যাজিক দেখাতে হবে।

কোনো উপায় নেই। ঠিক হলো যা কিছু যোগাড়যন্ত্র শহরের লোকেরাই করবে। পরের দিন বিকালে স্টেশনের সামনের মাঠে ম্যাজিক দেখাতেই হবে।

সেই রাতে মদনমোহন ও অপর্ণা কারোর চোখের পাতাতেই একবিন্দু

ঘুম নেই। ম্যাজিক বা যাত্নবিভা সামান্ত জিনিস নয়। তারা এসবের ক খ গ পর্যন্ত জানে না। কি ম্যাজিক দেখাবে?

সবচেয়ে ভালো ম্যাজিক হতে পারে পালিয়ে যাওয়া। একেবারে এখান থেকে নিরুদ্দেশ, গায়েব হয়ে যাওয়া। কিন্তু পাঁড়েজির চোখ ফাঁকি দিয়ে হোটেল থেকে বেরুনো অসম্ভব। তাছাড়া এই আধাচেনা দেহাতি শহরে রাতের বেলা বৌ নিয়ে বেরুনোও বোধহয় খুব নিরাপদ নয়। আর দিনের বেলা সারাক্ষণ পিছনে ফেউয়ের দল লেগে। কি করে পালানো যাবে তাদের চোখের সম্মুখ থেকে।

সুতরাং সমস্যার শেষ নেই। ম্যাজিক যদি না দেখাতে পারে তাহলে কি হবে, দুজন মিলে তাই ভাবতে লাগলো।

এদিকে ভোর হয়ে এলো। ভোরের বেলা মদনমোহনের মাথা একটু একটু করে সাফ হয়ে এলো। ছাত্রজীবনেও সে দেখেছে পরীক্ষার আগে যে যত রাত জেগেছে তত তার মাথা সাফ হয়েছে। সে অপর্ণার সঙ্গে এবার ম্যাজিক নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো, দুজনে কে কতো রকম ম্যাজিক দেখেছে তাই দিয়ে একটা ফিরিস্তি বানালো।—

(১) খড়ি গুঁড়ো করে আবার ভালো করা।

(২) একশো টাকার নোট পুড়িয়ে ফেলে আবার ঠিক করা।

(৩) হাতে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে চাবি কুয়োর জলে ফেলে দিয়ে হ্যাণ্ডকাফ অনায়াসে খুলে ফেলা।

(৪) বাক্সের ভিতর আটকিয়ে রেখে বের করে আনা।

(৫) পাখি উড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনা।

(৬) চলন্ত ট্রেন স্টেজের উপর নিয়ে আসা।

॥ ৫ ॥

পরের দিন বিকাল বেলা, স্টেশনের সামনের মাঠ লোকে লোকারণ্য। সকালেই মদনমোহন ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছে তার কি কি জিনিস প্রয়োজন। সব ঠিকমতো এসে গেছে।

সাড়ে পাঁচটায় ম্যাজিক আরম্ভ হবার কথা। মদনমোহন তার প্রফেসর এম. এম. সরকার লেখা স্যুটকেস এবং অপর্ণাসহ পাঁচটা নাগাদ মাঠে এসে পৌছলো। আগেই খোঁজ নিয়েছে মাঠের পাশে যে রেল লাইন সেখান দিয়ে কলকাতার একটা ট্রেন যায় সাড়ে ছটায়, তবে এ স্টেশনে দাঁড়ায় না দাঁড়ায় গিয়ে পরের জংশন স্টেশনে।

ম্যাজিকের মাঠে গিয়ে প্রথমেই মদনমোহন খোঁজ করলো স্থানীয় স্টেশনমাস্টার এসেছেন কিনা। তাঁকে খুঁজে বের করে একেবারে মঞ্চে এনে বসালো। তারপর মিলিয়ে নিলো ফিরিস্তি অনুযায়ী জিনিস এসেছে কিনা। সবই ঠিক এসেছে। একজোড়া হামানদিস্তা, দারোগাবাবুর থানা থেকে দুটো হ্যাণ্ডকাপ, বাজারে জুতোর দোকান থেকে বড়ো কালো স্টিলের বাক্স। একটা খাঁচাসুদ্ধ পাখি আনার কথা ছিলো, সেটাও আনা হয়েছে। একটা সুন্দর তোতা পাখি। বেশ কথা বলে। কিন্তু অতি বজ্জাত, মদনমোহনকে দেখেই, 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে লাগলো। পাখিটার উপর বিষম রাগ হলো মদনমোহনের। প্রথমেই বিদায় করতে হবে এটাকে।

সাড়ে পাঁচটায়, একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে মদনমোহন আর অপর্ণা উঠে গেল মঞ্চের উপরে।

প্রথমেই পাখির খেলা। খাঁচাসুদ্ধ পাখিটাকে হাতে নিয়ে মদনমোহন জিজ্ঞাসা করলো, 'এই তোতা পাখিটা কার?' এখানকার বি. ডি. ও. সাহেবের স্ত্রী গর্বিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন, 'এ পাখিটা আমার।'

'এ পাখিটা আপনার ভালো লাগে?' জাত যাদুকরের মতো মদনমোহন প্রশ্ন করলো।

বি. ডি. ও. সাহেবের স্ত্রী ডগমগ হয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। এইরকম আরো একটা পাখি আপনাকে আনিয়ে দিচ্ছি আমি।' বলে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলো মদনমোহন। এতোক্ষণ পাখিটা তারস্বরে 'চোরচোর' বলে চেঁচাচ্ছিলো, এইবার 'সাধু সাধু'

বলে উড়ে গেল। উড্ডীয়মান তোতাপাখিটার দিকে মদন ও অপর্ণা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো যতোক্ষণ না সেটা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল।

এইবার দ্বিতীয় খেলা। মঞ্চের সামনে অপর্ণা এগিয়ে গেল। তারপর মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'আপনাদের কারোর হাতে কী সোনার ঘড়ি আছে?'

সুন্দরী কণ্ঠের এই প্রশ্নে একসঙ্গে দশ-বারোটা মণিবন্ধ এগিয়ে এলো। একবার মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে সবকটাই খুলে নিলো অপর্ণা। তারপর হামানদিস্তার মধ্যে ফেলে স্টেশনমাস্টারমশাইকে বললো, 'আপনি এগুলো গুঁড়ো করে ফেলুন একেবারে।'

এরপরে আবার একবার অপর্ণার মধুর অনুরোধ শোনা গেল, 'আপনাদের কারো কাছে একশো টাকার নোট থাকলে দিয়ে দিন।'

বেশি নয়, মাত্র তেইশটা একশো টাকার নোট পাওয়া গেল। নোটগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্যে দর্শকদের মধ্য থেকে কাকে যেন অপর্ণা ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু মদনমোহনের মনের মধ্যে তখন অমানুষিক উত্তেজনা। সে নিজেই সবকটা নোট গোছা করে ধরে দেশলাই কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে ফেললো।

হতবাক, বিস্মিত জনসমুদ্র ম্যাজিসিয়ান দম্পতির খেলা দেখতে লাগলো মনের আনন্দে।

এইবার হ্যাণ্ডকাপ দুটো হাতে তুলে নিলো মদনমোহন। তারপর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই একটা মাত্র চাবি; এ ছাড়া আর কোনো চাবি দিয়ে খোলা যাবে না তো?'

দারোগাবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, না।'

'আপনি ছাড়া আপনার থানার আর কে আছে এখানে?' মদনমোহন জিজ্ঞাসা করতে দেখা গেল অনেকেই, বোধহয় থানার সবাই এখানে। মদনমোহন হাবিলদারকে আর সেই দারোগাবাবুকে মঞ্চে ডেকে এনে

দুজনের হাতে আচ্ছা করে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

এবার পাঁড়েজির পালা। পাঁড়েজিকে ডাকতে তিনি মঞ্চে উঠে এলেন। বিরাট স্টিলের বাক্সের ডালা তুলে তার মধ্যে পাঁড়েজিকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তারপর মদন নিজের হাতে একটা শক্ত ছয় লিভারের তালা সেই বাক্সের গায়ে লাগিয়ে দিলো।

এবার একজন দর্শককে ডেকে বললো, 'সামনের ঐ ইঁদারার মধ্যে এই হাতকড়ার আর বাক্সের চাবি ফেলে দিন।'

আর একটামাত্র কাজ বাকি। স্টেশনমাস্টারকে বললো, 'ঠিক আছে, আপনাকে আর ঘড়ি গুঁড়ো করতে হবে না। এখন এই সাড়ে ছটায় যে ট্রেনটা আসছে, সেটা এখানে এই সভার পাশে সিগন্যাল দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন। আমরা উঠে গিয়ে সেটাকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসি।'

স্টেশনমাস্টার আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমবেত জনতার দাবিতে তাঁকে সিগন্যাল দেখাতেই হলো। গাড়ি ঘ্যাচাং করে থেমে যাওয়ামাত্র প্রফেসর মদনমোহন সরকার এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে স্ত্রীকে ধরে সোজা গাড়ির ড্রাইভারের কামরায় উঠে বললেন, 'গাড়িটা ছেড়ে দিন। না হলে এই গাড়িটা ঐ মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। লাইন ছাড়া গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন? না হলে সবাই মারা পড়বো। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিলো। কিন্তু মঞ্চের উপর উঠে এলো না; যখন বুঝতে পারলো যাদু-পিপাসু জনতা, তখন মদন-অপর্ণা জংশন স্টেশনের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছে।

পরাণ যাহা চায়

আগে এমন হতো না। যতো বয়েস বাড়ছে, গৌরনাথের মেজাজ চড়া হচ্ছে। গৌরনাথ সান্যাল গান গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে।। সিনেমায়, বেতারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, দেশের ঘরে ঘরে গত পঁচিশ বছর ধরে সেই মধুর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়েছে।

যারা তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে তারা বিশ্বাসই করতে পারবে না, আজ সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁদের প্রিয় গায়ক গৌরনাথ সান্যাল আশি বৎসরের বুড়ো অম্বলের রোগীর মতো এমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়েছেন জীবনে আর কিছুতে সুখ নেই গৌরনাথের। ধপধপে কাচা পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবিতে না, গোল্ড ফ্লেক সিগারেটে না, এমন কি আষাঢ় মাসের সন্ধ্যাবেলা কেউ একটা কাঁঠালি চাঁপা ফুল এনে দিলেও আর ততো সুখী হন না গৌরনাথ। অথচ আগে কি যে ভালো লাগতো এই সব, আজকাল সব বিস্বাদ হয়ে গেছে।

গৌরনাথের মেজাজ সপ্তমে ওঠে যখন গান, সুর কিংবা লয়ের ব্যাপারে কোথাও কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে। কতো সঙ্গীতসভা থেকে তিনি উঠে এসেছেন, কতো চিত্রপরিচালকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, রেকর্ড কোম্পানীর কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দিয়েছেন এই সব ছোটোখাটো কারণে, অবশ্য কারণগুলো গৌরনাথের কাছে মোটেই সামান্য বা ছোটোখাটো নয়। তবু গৌরনাথের বাজারদর পড়েনি, বরং দিনে দিনে বেড়ে গেছে, বোধহয় তাঁর মধুর কণ্ঠ আর সুরজ্ঞানকে এই জন্যে দায়ী করা যেতে পারে।

পাশের ফ্ল্যাটে, গৌরনাথ রাত্রিতে বাসায় ফেরার সময় লক্ষ্য করলেন,

তালা পড়েছে। চলে গেছে, একেবারে পাকাপাকি চলে গেছে? ···মনে মনে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গৌরনাথ। বাঁচা গেল, দরজার পাশে এক ঘর অ্যাডমায়ারার আর রাতদিন সেই সব ভয়ঙ্কর সুরের গান, তাঁর টিয়া পাখিটা তো মরেই গেল···বাঁচা গেছে। আজ কদিন হলো কথাটা শুনছিলেন। ওরাই কে বলছিলো, 'আমরা চলে যাচ্ছি, গৌরবাবু।' গৌরবাবু 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে মনে মনে আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

অনেকদিন পরে বেশ শাস্তির সঙ্গে ঘুম হলো গৌরনাথের। এই সন্ধ্যা-তেই এক গানের আসরে গিয়েছিলেন, সেখানে একটা মোটামতো মেয়ে যা বেসুরো গলায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গানটি, 'আমার কি বেদনা সে কি জান', গাইছিলো। সারারাত ঘুম না হওয়ারই কথা। পুরো একটা লাইনই মেয়েটি গাইতে গাইতে ঘুলিয়ে ফেললো, শব্দ-সুর সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। পাশের বাড়ির আপদ বিদায় হয়েছে এই এক স্বস্তি না হলে মেয়েটাকে একটা টেনে থাপ্পড় কষানো হয়নি এই জ্বালায় সারারাত ডান হাত টন্‌টন্‌ করতো, বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে হতো।

পরদিন সকালেই কিন্তু আরেক গোলমাল হলো। রামমনোহর দুবের সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেল। অনেক দিনের পরিচয় সিনেমার কারবারী রামমনোহরের সঙ্গে, অনেক অত্যাচার সয়েছেন রামমনোহর দুবের, অবশ্য দুবে তার বিনিময়ে টাকাও দিয়েছে, কিন্তু আর নয়। এবার একটা স্ক্রিপ্ট এনে দিয়েছিলো। দুবে বলেছিলো দুটো জায়গা বেছে রবীন্দ্রনাথের দুটো জুতসই গান লাগিয়ে দিতে হবে আর তার পরিচালনাও করতে হবে গৌরনাথকে।

গৌরনাথ রাজি হয়েছিলেন। স্ক্রিপ্টটা পড়ে তাঁর বিশেষ পছন্দ হয়নি। তবু ওর মধ্যে দুটো লাগসই জায়গা বেছে নিলেন। যেখানে নায়িকা ধাত্রীবিদ্যা শিখতে সুইজারল্যাণ্ড চলে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক এলো-

মেলো চুলে, দমদম এরোড্রোমে ধাবমান এরোপ্লেনের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, প্লেনের ক্ষীণ শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র গান শুরু হবে, 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।' রামমনোহর ছুবের সঙ্গে ঝগড়া হলো এই গানটা নিয়েই, ঝগড়া থেকে প্রায় হাতাহাতি, বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া পর্যন্ত।

একটু পরে ধীর মস্তিষ্কে ভেবে দেখলেন গৌরনাথ, রামমনোহরের বাস্তবিক খুব দোষ ছিল না। রামমনোহর বলেছিল, 'দেখিয়ে গৌরবাবু, আপনাদের সহিত মিলিয়ে মিশিয়ে হামিও বাঙলা বেশ জানিয়ে গেছি। গুরুদেবের এ গানটা তো সুবিধা হলো না। কি রকম যেনো গোলমেলে হোয়ে গেল।'

'কিসের গোলমেলে!' বিস্মিত বোধ করেছিলেন গৌরনাথ।

'এই দেখুন একদফা দিলে হলো আবার প্রাণে কেনো?' রামমনোহর হাসতে হাসতে বলেছিলো।

একটু পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গৌরনাথ ছুবেকে বুঝিয়েছিলেন হিন্দি 'দিলে' অর্থ যাই হোক এখানে দিলে আর প্রাণে এক নয়।

কিন্তু গোলমাল এতে মিটলো না, এমনিই মেজাজ চড়ে গিয়েছিলো। পরের গানে 'ফাগুনের ফুল গেছে ঝরিয়া' শোনামাত্র ছুবে আপত্তি জানালো।

'মালতী তো (মালতী কাহিনীর নায়িকার নাম) সুইজারল্যাণ্ড গিয়েলো আপনি ঝরিয়া গাইবেন কেনো, উটা সুইজারল্যাণ্ড করা যায় কি না?'

'না, যায় না; বেরোন, বেরোন বলছি, এক্ষুনি। বলাই, বলাই!'

বলাই নামে চাকরকে আর ডাকতে হয়নি গৌরনাথের, তার আগেই রামমনোহর গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেছে।

'দেখে-লিবো, এ পাগলামি কোতোদিন যায়।'

গৌরনাথের একটু অনুশোচনাই হলো না, কাজটা ভালো হয়নি। রাম-

মনোহর লোকটা যে খুব খারাপ তা তো নয়।

এর মধ্যে সিঁড়িতে খটখট দুমদাম শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে খাট, চেয়ার, টেবিল কারা সব তুলছে। পাশের ফ্ল্যাটে বোধহয় নতুন ভাড়াটেরা এলো। কলকাতা শহরে একদিনও বাড়ি পড়ে থাকে না, একদিনের জন্যেও শান্তি মেলে না। গৌরনাথের ঘরের পর্দাটা হাওয়ায় উড়ছিলো, তারই ফাঁক দিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলেন একটি সুদর্শন যুবা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র খবরদারি করছে। ভেতরে ঘরের মধ্যে একটি ইতস্তত সঞ্চরমানা শাড়ির আঁচলও নজরে পড়লো। ছেলেটির সাজসজ্জা দেখে মনে হলো সদ্য বিয়ে করেছে, জিনিসপত্র যা ঘরের মধ্যে যাচ্ছে সবই নতুন, মেসবাড়ি থেকে ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে এলে যা হয়। একনজর মেয়েটিকেও দেখতে পেলেন; ঠিক তাই, চোখে মুখে শুভ-পরিণয়ের সদ্য সিঁদুর।

একটু ভয়টা কাটলো। না, বাচ্চাকাচ্চা কিছু নেই। হারমনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবার মতো কাউকে মনে হচ্ছে না। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন বাদ্যযন্ত্র কিছু ওঠে কিনা মালপত্রের সঙ্গে। না নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গৌরনাথ, একটু উদাসও হলেন. এই সাতচল্লিশ বৎসর বয়সেও নবদম্পতি দেখলে বুকটা একবার হুহু করে ওঠে, সারা-জীবন ধরে প্রেমের গান গেয়েছেন ব্যাচিলার গৌরনাথ। সত্যি পাকা, কনফার্মড ব্যাচিলার বলে সত্যি কি কিছু আছে? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন গৌরনাথ। বছর পঁচিশেক আগে একটি মেয়েকে গান শেখাতে গিয়ে মেয়েটির মাথায় এক কাপ গরম চা ঢেলে দিয়েছিলেন। হঠাৎ সেই মেয়েটির সেই হতভম্ব মুখশ্রী তাঁর মনে পড়লো।

এই ঔদাসীন্য কিন্তু বেশিক্ষণ রক্ষা করা গেল না। কানে একটা গানের গুনগুনানি শুনতে পেলেন, বারান্দায় দাঁড়ানো ছেলেটি মৃদুস্বরে একটা গানের কলি ভাঁজছে,

‘আমার পরাণ যাহা চায় তাই তুমি তাই গো।’

আতঙ্কিত গৌরনাথ কান খাড়া করে রইলেন, কি সর্বনাশ। একটু লক্ষ্য করতেই বুঝলেন ছেলেটির গলা পাকা, সুরটুর ঠিকই আছে। একটা লাইনই বারবার গাইছে, সুর ঠিকই আছে কিন্তু কি একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে। ইজিচেয়ারে উঠে বসলেন গৌরনাথ। এই ছাখো 'আমার' শব্দটা বাদ দিয়ে দিলে। 'আমার পরাণ যাহা চায়' না গেয়ে শুধু 'পরাণ যাহা চায়' 'পরাণ যাহা চায়' বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা লাইন—'পরাণ যাহা চায়' 'পরাণ যাহা চায়' ক্রমাগত ক্রমাগত; অসহ্য হয়ে উঠে সামনের দরজা বন্ধ করে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসলেন গৌরনাথ। একটু পরে একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে শুয়ে পড়লেন, মাথায় একটা বালিশ চাপা দিয়ে।

বিকেলের দিকে তাঁর নতুন প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো। এখন ভালোই লাগলো এদের, মেয়েটি ভারী ভালো, ছেলেটিও ভালো। বেশ সরল, বেশ নিষ্পাপ মুখ ছেলেটির। দেখলে মনেই হয় না সকাল বেলা অতো বড় অন্যায় করছিলো একটা শব্দ বাদ দিয়ে। প্রথম শব্দ-টাই বাদ দিয়ে অমন সুন্দর গানটাকে খুন করে ফেলা—এর পক্ষে সম্ভব! মনেই হয় না। আর সুরটা তো ঠিকই জানে। পুরো গানটা না গেয়ে খালি ঐ ভাঙা লাইনটা। ছেলেটার মুখ কিন্তু ভারী সরল, দুজনকেই পছন্দ হলো তাঁর। আজ পঁচিশ বছর ধরে নিজের প্রশংসা শুনে শুনে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে। তবু আজ এই বিকালবেলায় এই সুশ্রী দম্পতির মুখে প্রশংসা শুনতে খারাপ লাগলো না।

বেরিয়ে যাওয়ার পথেই কিন্তু আবার সেই বিপর্যয়। ছেলেটির ঠোঁটে সেই ভাঙা লাইন, সেই গুনগুনানি। কিছু বলবার আগেই ওরা বেরিয়ে গেল, সিঁড়ি দিয়ে হাত ধরাধরি করে নিচে নেমে গেল। ছেলেটি গুন-গুন করছে, মেয়েটি নীরব। ছেলেটি কি প্রথম শব্দটা ভুলে গেছে, জানে না?

পরের দিন সকালে সামনের কমন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গৌর-

নাথ। জানলার ওপাশ থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলেন সেই কবন্ধ গুনগুনানি। এমন হলো, রাতদিন আর কিছু ভাবতে পারেন না। সামনের ঘরের দরজাটা খুললেই বা জানলাটা মেলে দিলেই 'পরাণ যাহা চায়, পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো' বারবার ঘুরে ফিরে; অস্থির হয়ে গেলেন গৌরনাথ।

সেদিন প্রথম আলাপে ছেলেটির নাম জানা হয়নি। আজ লক্ষ্য করলেন, ওদের দরজার ওপরে একটা সংক্ষিপ্ত নেমপ্লেট টাঙানো রয়েছে, 'পি. কে. রায়'। ভাবলেন গিয়ে একবার নক করেন, বলে আসেন, এভাবে গানটা না গাইতে। কিন্তু আবার ভাবলেন, সেটা কি খুব অভদ্রতা হবে না, আর ওই বা আমার কথা মানতে যাবে কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন গৌরনাথ; প্রথমে রাস্তায় একটু এদিক-সেদিক হাঁটলেন, তারপর সোজা রামমনোহরের ওখানে। গোলমালটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো, গিয়ে কিন্তু রামমনোহরের দেখা পেলেন না। দেখা হলে মিট-মাট হয়ে যেতো নিশ্চয়।

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিকালের দিকে বাসায় ফিরলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন ছেলেটা নামছে। সেই সরল মুখ, সেই সুদর্শন যুবক কিন্তু কি বীভৎস! ঠোঁটে সেই কবন্ধ গুনগুনানি : এর কি কোনো শেষ নেই। ছেলেটি নিজের মনে নেমে যাচ্ছে, তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু নামতে দিলেন না গৌরনাথ, একেবারে মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ছেলেটির সার্টের কলারটা চেপে ধরলেন, 'এর মানে কি? এ সব কি?'

ছেলেটি একেবারে হকচকিয়ে গেছে, 'আজ্ঞে, আজ্ঞে কি বলছেন, কি বলতে চাচ্ছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না? পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো, আমার কি হলো? আমার শব্দটা কি উড়ে গেল? ওটা কি জানেন না, আর কোনো লাইন নেই, আর কোনো গান নেই?' দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে থাকে গৌরনাথের।

এইবার যেন ছেলেটি একটু বুঝতে পারে, ব্যাপারটা যেন বোধগম্য হয়েছে তার। একটু হেসে অনুরোধ করে।

'আজ্ঞে জামাটা ছাড়ুন, বলছি। ঐ শব্দটা আমার দরকার নেই।'

জামার কলারটা একটু আলগা করেন গৌরনাথ।

'দরকার নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নতুন বিয়ে করেছি সেদিন আপনাকে তো বলেছি।'

'হ্যাঁ, তাই কি হলো? লাইসেন্স পেয়েছেন যে কোনো গান যে কোনো ভাবে খুন করবার?' আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন গৌরনাথ।

ছেলেটি কিন্তু চটে না। গৌরনাথকে সে যেন বেশ বুঝতে পেরেছে। বলে, 'আজ্ঞে আরো একটা কথা আছে'।

'কি কথা?'

ঐ শব্দটা, ঐ আমার শব্দটা আমার কোনো দরকার নেই, আমার নিজেরই নাম পরাণ।' গৌরনাথের হাত ছাড়িয়ে 'পরাণ যাহা চায় তুমি তাই গো' গুনগুন করতে করতে ছেলেটি নিচে নেমে যায়। হতবাক গৌরনাথ সিঁড়ির উপরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

হে বন্ধু বিদায়

শেক্সপীয়ারের ওথেলো নাটকের তৃতীয়-অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ইয়াগোকে সেই যে ওথেলো বলেছিল,

Farewell ! Othello's occupation is gone.'

বিদায় ! ওথেলোর কাজ শেষ হয়েছে, সেই সুদীর্ঘ ফেয়ারওয়েল মালা আমার শুকনো কলমে নীরস অনুবাদ করে এই বিদায়বেলায় আমি কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না বরং গল্প বলি। যদি গল্পগুলিতে বিদায়ের সুর তেমন না বাজে, তার জন্যে আমি দায়ী নই বিদায়গ্রহণ নিয়ে রসিকতা সহজ নয়।

প্রথম দুটি কাহিনীই বড় মর্মান্তিক। দুটিই বিদায়দান সংক্রান্ত। প্রথমটি হলো এক খবরের কাগজে এক গোলমেলে সাংবাদিককে বিদায় করা নিয়ে।

একদিকে সেই সাংবাদিকের যেমন ধারণা ছিল যে তাঁর মত কাউকে পাওয়া যাবে না. অন্যদিকে পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ একাধিক কারণে এই ভদ্রলোককে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সাংবাদিকটি যখন নিজেকে ভাবতে শুরু করেছেন যে পত্রিকাটি তাঁর জন্যেই চলছে, এই কাজের যা কিছু শ্রীবৃদ্ধি সে তাঁরই অবদান, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি, যোগাযোগ বাস্তববোধ ভবিষ্যতবাণীর ক্ষমতা সে সব নাহলে এই পত্রিকা চলবে না, অর্থাৎ এক কথায় ইংরেজীতে যাকে বলে ইনডিসপেনসেবল মানে অপরিহার্য; সাংবাদিকটি যখন নিজেকে একশর মধ্যে একশ দশ নম্বর দিতে শুরু করেছেন এবং তাই শুধু নয় অন্যান্য সহকর্মীদের শূন্য কিংবা দশ বা পাঁচ দিচ্ছেন সেই সময় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন, না খুব বেশি হয়ে গেছে

আর নয়।

সাংবাদিক ভদ্রলোককে কর্তৃপক্ষ একদিন ডাকলেন, তারপর তিনি যে রকম নিজের সম্পর্কে ভাবছেন ঠিক তাই তাঁকে বললেন, 'দেখুন, জানি না আপনাকে ছাড়া আমাদের কেমন করে চলবে, জানি না আপনি না থাকলে এই কাজের কি অবস্থা হবে, কিন্তু আমাদের সামনের সপ্তাহ থেকে সেই চেষ্টাই করতে হবে, আপনাকে বাদ দিয়ে কাগজ চলে কিনা দেখতে হবে। এই আপনার তিন মাসের মাইনে, গ্র্যাচুয়িটি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের চেক। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলে কিনা দেখতে চাই।'

বিমূঢ়, বিহ্বল সাংবাদিকটির অবশ্যই কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু পরে তিনি সাবধান হয়েছিলেন, অন্যত্র যেখানে কাজ নিয়েছিলেন নিজেকে আর অপরিহার্য ভাবেন নি, ভাবলেও মনের ভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

দ্বিতীয় গল্পটি কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। এটি এক বিদায় অভিনন্দন সভা নিয়ে। এক বেসরকারি অফিসের বড়বাবু প্রায় চার-পাঁচবার দু-তিন বছর করে এক্সটেনসন পেয়ে অবশেষে সত্তর বছর বয়েসে চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন সেই উপলক্ষে বিদায় সভা। অফিসের সমস্ত কর্মচারী, মায় বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব সবাই তাঁর থেকে বয়েসে ছোট। সবাই সভায় উপস্থিত।

বড়বাবু সত্যিসত্যিই চাকরী জীবনে যথেষ্ট কর্মদক্ষ এবং জনপ্রিয় ছিলেন। সভায় গান হলো, 'জানি হলো যাবার আয়োজন, তবু পথিক থামো কিছুক্ষণ, 'ওগো যেয়ো না, যেয়ো না।' তারপর প্রশস্তি পাঠ 'হে কর্মবীর তোমার বিহনে আমাদের অন্ধকার,' 'তুমি চলে গেলে এ অফিসের সর্বনাশ', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরপরে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সন্দেশ, চাদর, বেতের পাকা লাঠি (অবসর গ্রহণকালে লোকদের লাঠি উপহার দেওয়া রীতি কেন?), উপহার দেওয়া হলো বড়বাবুকে। কর্তৃপক্ষ দিলেন একটি কাঁসার

থালা এবং স্বাস্থ্য পাওনার উপরে দশ হাজার এক টাকার একটি চেক।

এরপরে মাননীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই কোম্পানির বড়সাহেবের বক্তৃতা। বড়সাহেব বললেন যে, এরকম বড়বাবু তারা আর কখনও পাবেন না। দশ বছর তাঁরা বড়বাবুকে অবসরের পরেও আটকে রেখেছিলেন। তিনি এখন চলে যাচ্ছেন, কি করে অফিস চলবে কে জানে।

আগের গল্পে সাংবাদিক ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন, এখানে বড়বাবুর বিষয়ে বড়সাহেব ঠিক সেই সব কথাই বললেন। মোদ্দা-কথা বড়বাবু ছিলেন ইনডিসপেনসিবল, এখানে তাঁকে বাদ দিয়ে কি করে চলবে কে জানে?

সর্বশেষে বড়বাবু বিদায় অভিভাষণ দিতে উঠলেন। সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনি নিজের গলার ফুলের মালা বড় সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন, দশহাজার এক টাকার চেকটিও তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে দিলেন। অবশেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি আমাকে ছাড়া এ অফিস চলবে না। আমার আগেই বিশ্বাস ছিল এখন আপনাদের সকলের বক্তৃতা শুনে জানলাম,বুঝলাম যে আমি কতটা অপরিহার্য। আমি রিটায়ার করছি না। আমি আবার কাল থেকে অফিসে আসছি।

পুনশ্চ : তারাপদ রায়ের লেখাপড়া বা জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা যথেষ্ট পেয়েছেন। এবার বিদায়বেলায় ইংরেজী কেতায় বল আপনাদের ঘরে ফিরিয়ে দিচ্ছি, একটি সরল, সোজা প্রশ্ন রাখছি আপনাদের কাছে। যদি উত্তর দিতে পারেন জীবনে আর কোনো দিন এই মূর্খের লেখা পড়বেন না। কারণ এর উত্তর সে জানে না।

প্রশ্নটি হলো,

কেউ যদি তার বিধবা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করে সেটা কি বেআইনী হবে?

—:)●(:—